এখন ডুয়ার্স

১ - ১৫ মার্চ ২০১৭। ১২ টাকা

শিলিগুড়ি জেলার দাবি এবার জোরদার হবে?

খেলবো হোলি রং দেব না এ কখনও হয়?

চা-মজুরির ক্যাশলেস ও ডিজিটাল ব্যবস্থা এখনও বহু দূর

হুজুর সাহেবের মেলা

facebook.com/ekhondooars নিয়মিত পাঠক হলে নাম ও নম্বর পাঠান 9830410808

মিশন নির্মল বাংলা প্রকল্পকে সার্থক করতে এগিয়ে চলেছে শীতলকুচি পঞ্চায়েত সমিতি

মিশন নির্মল বাংলাকে সার্থক করতে চলছে প্রচার অভিযান

কোচবিহার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে শীতলকুচি। আটটি গ্রাম পঞ্চায়েত সমিতি রয়েছে এই শীতলকুচি পঞ্চায়েত সমিতির অধীনে। মিশন নির্মল বাংলাকে সার্থক করার জন্য জেলার প্রত্যেকটি পঞ্চায়েত সমিতির মতো শীতলকুচি পঞ্চায়েত সমিতিও মানুষকে সচেতন করার নানান ধরনের কর্মসূচী নিয়েছে। এখানকার পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কৃষ্ণকিশোর রায় সিংহ জানান, শীতলকুচি পঞ্চায়েত সমিতি ঠিক করেছে যে এখানে সরকার আর কারও পায়খানা তৈরি করে দেবে না। যাদের পায়খানা নেই, তাদের প্রত্যেককে নিজেদের পায়খানা নিজেদের তৈরি করে নিতে হবে। এই নিয়ে আমরা প্রচুর প্রচার চালিয়েছি। লোকজনের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানোর চেষ্টা করেছি। সবচেয়ে আশার কথা হল, মানুষ এগিয়ে এসেছে। তারা নিজেদের পয়সায় বাড়িতে পায়খানা তৈরি করেছে। উন্মুক্ত জায়গায় আর কেউ শৌচকর্ম করছে না।

এসবের পাশাপাশি স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে যদি দেখি, বরমরিচা পিএসসি-তে নতুন হাসপাতাল তৈরি হচ্ছে। এখানকার হেল্‌থ সেন্টারে যে ডাক্তার রয়েছেন, তাঁরাও যথেষ্ট নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে চলেছেন বলে জানালেন সেখানকার বিডিও অঞ্জন চৌধুরী। বললেন, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের যে সমস্ত প্রকল্প রয়েছে, সব ক'টাই নিয়ম মেনে এখানে করা হচ্ছে। যেমন— BADP, MGNRE– MSDP, NREGS, বিধায়ক উন্নয়ন তহবিলের টাকা যা পাওয়া যাচ্ছে, তার সদ্ব্যবহার করা হচ্ছে। প্রায় ৭০ লক্ষ টাকা ব্যয় করে শীতলকুচি পঞ্চায়েত সমিতির অফিস চত্বরের মধ্যেই তৈরি হচ্ছে একটি কমিউনিটি হল। ছিটমহলে দুটো কমিউনিটি সেন্টার তৈরি করা হচ্ছে ১ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা করে।

শীতলকুচি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কৃষ্ণকিশোর রায় সিংহ (ডান দিকে) ও বিডিও অঞ্জন চৌধুরী

যোগাযোগব্যবস্থার উন্নতির জন্য বেশ কয়েকটি রাস্তা তৈরি করা হয়েছে। BADP থেকে ৪ কিলোমিটার বিটুমিন রাস্তা তৈরি করা হচ্ছে, এতে খরচ পড়ছে প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা। প্রায় ২০ কিলোমিটার গ্রাভেল রোড তৈরি করা হচ্ছে অন্যান্য ফান্ড থেকে। এ ছাড়াও মহিষমারিতে একটা জয়েজ ব্রিজ করা হয়েছে।

শীতলকুচিতে ২৯৩টি স্যাংশন অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টার থাকলেও তার মধ্যে কাজ হয় ২৮৬-টিতে। অ্যাডিশনাল ক্লাসরুমের কাজ চলছে অনেকগুলো জায়গায়। NRGES থেকে ৯টি সেন্টারের জন্য এবং RIDF থেকে ১৭টি সেন্টারের জন্য ঘর করে দেওয়ার কাজ চলছে। এগুলো হয়ে গেলে অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারের জন্য আর কোনও ঘরের অভাব থাকবে না।— জানালেন সভাপতি কৃষ্ণকিশোরবাবু। বললেন, ইতিমধ্যেই দুটো স্কুলের জন্য হস্টেল তৈরি হয়েছে MSDP থেকে। একটি শীতলকুচি হাই স্কুল, অন্যটি নগর ডাকালিগঞ্জ হাই স্কুল। বড়মরিচা হাই স্কুলে মেয়েদের একটি হস্টেল হচ্ছে। স্কুলের টয়লেট, রান্নাঘর ইত্যাদি পরিষ্কার রাখার জন্য শুচি শিক্ষাঙ্গন প্রকল্প চালু হয়েছে। ১২,০০০ পরিবারকে NREGS-এর তরফ থেকে ইন্ডিভিজুয়াল বেনিফিট স্কিম দেওয়া হচ্ছে।

নিজস্ব প্রতিনিধি

কফি হাউস ? ক্লাবঘর ?
নাকি আরও অনেক কিছু ?

**চা-টা। আড্ডা। দাবা-ক্যারম-টেবিল টেনিস। পার্টি। গেট টুগেদার।
সেমিনার। বেড়াতে যাওয়ার বইপত্র ও বুকিং।**

সোম-শুক্র বেলা ১টা থেকে রাত ৯টা
শনি-রবি বিকেল ৫টা থেকে রাত ৯টা
ফোন - ০৩৫৬১-২২২১১৭
পরিচালনায় NEST SOCIETY (Regn. No. S/2L/5822 of 2013-14)

আড্ডাঘর

মুক্তা ভবনের দোতলায়, মার্চেন্ট রোড, জলপাইগুড়ি - ৭৩৫১০১
ফোন - ০৩৫৬১-২২২১১৭

যে কেউ সদস্য হতে পারেন। যে কেউ যোগ দিতে পারেন।

ছ'মাসের এককালীন সদস্য নেওয়া হচ্ছে

তৃতীয় বর্ষ, ১২ সংখ্যা , ১-১৫ মার্চ ২০১৭

এই সংখ্যায়

সম্পাদকের ডুয়ার্স

নির্বিকার সমাধির পথে ৪

পাঠকের কলম

উত্তরের বাগিচায় ক্যাশলেস ব্যবস্থা ১৪

ঘাসফুল আর কাস্তে-হাতুড়ির ভালবাসার অসম্ভব কাহিনি ৩৮

হলদিবাড়ির পবিত্র হুজুর সাহেবের মেলা ৪০

দৃষ্টিহীন ছেলেমেয়েদের নিয়ে প্রকৃতিপাঠ শিবির ৪২

দূরবিন

কালিম্পং জেলা হওয়ায় শিলিগুড়িকেও এবার জেলা করার দাবি উঠতে বাধ্য ১০

ভাঙা আয়না

পাখি-পাগল শিবুন ভৌমিক ৩০

ডুয়ার্সের ডায়েরি

ডুয়ার্সে এখনও দোলের দিন বেশিটাই প্রেম, বেশিটাই উৎসব ৬

নিয়মিত বিভাগ

সংঘ-সংস্কৃতির ডুয়ার্স ৩৪

বইপত্রের ডুয়ার্স ৩৭

খুচরো ডুয়ার্স ৮

ডুয়ার্স ডেঞ্জারাস ৪৩

ধারাবাহিক ডুয়ার্স

লাল চন্দন নীল ছবি ৩১

ডুয়ার্স থেকে দিল্লি ২০

তরাই উৎরাই ২৮

শ্রীমতী ডুয়ার্স

আজকের শ্রীমতী ২৬

ডুয়ার্সের ডিশ ২৭

প্রচ্ছদের ছবি: এবারের শ্রীমতী ডুয়ার্স সুকন্যা দত্তগুপ্ত (ফাইল চিত্র)

সম্পাদকের ডুয়ার্স

নির্বিকার সমাধির পথে

স্কুলের পরীক্ষায় ভাবসম্প্রসারণের পর মুদির দোকানে বা পাড়ার সেলুনের দেওয়ালে অনেক সময় নানারকম বাণী সম্বলিত পোস্টার চোখে পড়ে, যার মধ্যে একটি বেশ জনপ্রিয়— সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে। মজার ব্যাপার হল, এই বাণী মুখস্থ করলেও হৃদয়ঙ্গম করার কথা আমরা কিন্তু কখনই ভাবি না। আর তাই বোধহয় নিশ্চিন্তে পান খেয়ে আর গান গেয়ে দিন কাটিয়ে দিতে পারি। যেমন খবরের কাগজে খুনজখমের খবরে আমাদের কোনও হেলদোল হয় না। পাশের পাড়ায় কোনও কিশোরীর অপহরণ বা ধর্ষণ হলে তা উল্টে আমাদের একবেলার গুলতানির রসদ যোগায়। বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আজও যখন কোনও অন্যায়ের প্রতিবাদে মুখর হয় পড়ুয়া সমাজ, নিজের বাড়ির ছেলে বা মেয়েটিকে উপদেশ দিই ও সব থেকে দূরে থাকতে। যতক্ষণ পর্যন্ত না অপরাধ আমাদের নিজেদের বাড়ির দোরগোড়ায় এসে কড়া নাড়ে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা নির্বিকার চিত্তে রোজকার কাজকম্মো চালিয়ে দিতে পারি। অথচ আমাদের এই অসীম ক্ষমতায় আমরা কিন্তু কখনই গর্বিত বা অবাক হই না।

সম্প্রতি শিশু পাচারের অভিযোগে পুলিশের জালে ধরা পড়েছে এমন কয়েকজন মানুষ যারা আমাদেরই প্রতিবেশী, আমাদের মতই ছাপোষা নিরাপদে নির্বিঘ্নে জীবন যাপন করা মধ্যবিত্তদের সঙ্গে মিশেছিলেন। এতদিন নারীপাচার, শিশুপাচার জাতীয় জঘন্য সমাজবিরোধী কর্মকাণ্ডে ঠেকাদারি ছিল দাগী অপরাধীদের। আজ অপরাধের সব গণ্ডীরেখা ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গিয়েছে। কারণ আমরা নির্বিকার উদাসীন হতে শিখে গিয়েছি। এই ধরনের খবরে কিঞ্চিত চাঞ্চল্য ছড়ালেও যদি কারও মনে প্রশ্ন জাগে, আচ্ছা এই লোকগুলির কীর্তিকলাপ তো অনেকদিন ধরেই চলছিল অথচ প্রতিবেশী হয়েও আমরা এর বিন্দু বিসর্গ টের পাইনি কেন? এর উত্তরও কিন্তু একটাই হয়— আমাদের ক্রমবর্ধমান উদাসীনতা ও নিঃস্পৃহতা। শহরের অনেকেই আবার বুক ফুলিয়ে গম্ভীর হয়ে বলতে শোনা যাচ্ছে, না আমরা ব্যাপারটা জানতাম কিন্তু কেউ মুখ খুলিনি। তখন তারও উত্তর কিন্তু সেই একই— আমাদের সীমাহীন ভাবলেশহীনতা, যা সম্ভবত ঈশ্বরকেও অবাক করে দেয়।

তাত্ত্বিকরা বলবেন, এক অদ্ভুত সময়ের মধ্যে দিয়ে চলেছি আমরা, যেখানে কোনও প্রতিবাদ নেই, প্রতিকার নেই। প্রতিহিংসায় এক নেতিবাচকতার সুউচ্চ শিখরে বিরাজ করছি সবাই। আত্মহননে বুঁদ প্রজাতি, টেরই পাচ্ছি না, হলিউডি ছবির মতই ভিনগ্রহের অজানা মারণকীট পালে পালে হু হু করে ঢুকে পড়ছে আমাদের ঘরের ভেতর, বিছানার নিচে, বালিশের খোলে। এই আক্রমণ প্রতিহত করার যাবতীয় শক্তি হারিয়ে ফেলেছি আমরা। না, কোনও সুপারম্যান কমিক্সের পাতা থেকে উঠে আসবে না আর আমাদের রক্ষায়। রাতারাতি কীটেরা কুড়ে কুড়ে খাবে আমাদের হাত-পা-মস্তিস্ক। একদিন সকালে আবিষ্কৃত হবে মনুষ্য প্রজাতির নির্বিকার সমাধি।

এরপর আর রচিত হবে না কোনও ইতিহাস। এর বহুযুগ বাদে যদি কোনও মস্তিস্কসম্পন্ন প্রাণিকুলের আবির্ভাব ঘটে, সভ্যতার প্রাণহীন রাজপথ থেকে নেমে অলিগলি ঘুরতে ঘুরতে তারা কোনও বিবর্ণ দেয়ালে ঝুলে থাকা পোস্টার আবিষ্কার করতে পারে— অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে, তব ঘৃণা তারে যেন তৃণসম দহে।

সম্পাদক প্রদোষ রঞ্জন সাহা
ডুয়ার্সের ব্যুরো প্রধান শুভ্র চট্টোপাধ্যায়
সহকারী সম্পাদনা শ্বেতা সরখেল
অলংকরণ দেবাশিস রায়চৌধুরী
সার্কুলেশন দেবজ্যোতি কর, দিলীপ বড়ুয়া
বিজ্ঞাপন সেলস সুরজিৎ সাহা
ইমেল ekhonduars@yahoo.com
মুদ্রণ অ্যালবাট্রস, **প্রকাশনা** প্রদোষ রঞ্জন সাহা

ডুয়ার্সে ব্যুরো অফিস
মুক্তা ভবনের দোতলায়।
মার্চেন্ট রোড। জলপাইগুড়ি
ফোন ০৩৫৬১-২২২১১৭

এখন ডুয়ার্স পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তুর দায়িত্ব পত্রিকা কর্তৃপক্ষের নয়। যে কোনও প্রকার আইনি ব্যবস্থা কলকাতা এলাকার মধ্যে হতে হবে।

এই সংখ্যায় বেশ কিছু ছবি বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া হয়েছে। তাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

জলপাইগুড়ি পৌরসভা

জলপাইগুড়ি মিউনিসিপ্যালিটি সারা শহরের পরিচ্ছন্নতা নিয়ে অত্যন্ত তৎপর। নিয়ম করে রাস্তাঘাট পরিষ্কার রাখার কাজে শহরবাসীরাও যথেষ্ট সন্তুষ্ট। তবু কোনও কোনও জায়গা নিয়ে আরও নানান ভাবনা রয়েছে। ট্রাক্টরে করে আবর্জনা তুলে নিয়ে গিয়ে কম্প্যাক্টরের মাধ্যমে ছোট করে তা শহরের বাইরে ফেলে দেওয়া হয়। নর্দমা পরিষ্কার থাকার ফলে বর্ষায় জলনিকাশি সমস্যারও অনেকটাই সমাধান হয়ে যায়। জনগণের কাছে মিউনিসিপ্যালিটির আন্তরিক আবেদন, তাঁরা যেন এই কাজকর্মের ব্যাপারে পৌরসভাকে সহযোগিতা করেন।

শ্রীমতী পাপিয়া পাল
উপ-পৌরপতি
জলপাইগুড়ি পৌরসভা

শ্রী মোহন বোস
পৌরপতি
জলপাইগুড়ি পৌরসভা

খেলব হোলি রং দেব না তাই কখনও হয়?

বসন্ত-দিনের এই মোক্ষম সময়ে প্রত্যেক বছরই প্রশ্নটা মাথায় ঘাই মারে। দোল, নাকি হোলি? সময় ও পরিসরের গজ-ফিতে সরিয়ে রেখে জরিপ করলে বুঝতে পারা যায়, দোল যেমন আছে, তেমনি আছে হোলিও। দুটো নামমাহাত্ম্যে পরস্পরের আত্মীয় হতে পারে, কিন্তু তারা কখনওই সমার্থক নয়। দোল ও হোলির মধ্যেকার ফারাক বুঝতে গেলে পিছিয়ে যেতে হবে তিরিশ বছর। না, কেবল একদিন আগে বা একদিন পরের পার্থক্য নয়, এই তফাতের মধ্যে ডুবে আছে অনেক কিছুই। নিজের ভৌগোলিক অবস্থান ঈষৎ পালটে নিয়ে পিছোতে হবে আপনাকেই।

আজ থেকে তিন দশক আগের ডুয়ার্সে আহ্লাদ, আদিখ্যেতা আর লৌকিকতার চেহারাগুলো আদৌ আজকের মতো ছিল না। সেখানে সপ্তাহান্তের আমোদ মানে ছিল আত্মীয়র বাড়ি ভ্রমণ। ছুটির দিন লোকে আন্ডাবাচ্চার হাত ধরে রেস্টুরেন্টে চপ-কাটলেট খেতে গেলেও 'ইটিং আউট' শব্দবন্ধ তখন ছিল অজানা। আসলে সেই সভ্যতা ছিল স্থাণু অঙ্গন। এতটাই স্থির যে, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় থেকে শ্রীজাত পর্যন্ত দীর্ঘ সময়কালে তার গতিজাড্য অনুভব করা যায়নি। নীরাকে যে দারুণ রঙের মধ্যে সুনীল দেখেছিলেন, তা বছরে মাত্র দু'বার। সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে কোনও নারী হেসে উঠলেই জেগে

উঠত সত্যবদ্ধ অভিমান। রাবীন্দ্রিক বসন্ত-শালীনতার চাইতে বহু দূরে সেই ব্রীড়া, নীল দিগন্তে ফুলের আগুনের শিখা তখন যে রঙে উদ্ভাসিত হত, আজ এই গ্লোবাল ভিলেজে বসে তাকে অনুধাবন করা যাবে না।

সাতের দশক অবধি বাঙালির বসন্ত এমন অপার মহিমাতেই বিরাজ করত ডুয়ার্সে। বকুল শাখা-পারুল শাখার দিকে দ্বিধাদীর্ণ চোখে শেষবারের মতো তাকিয়েছিলেন জয় গোঁসাই। কেমন করে আবির দেওয়া যায় সেই বকুল-পারুলের একান্ত বান্ধবীটিকে, এই ভাবতে ভাবতেই একটা গোটা মানুষ পুড়ে ছাই। সেই ছাই উড়তে উড়তে পৌঁছে যায় বসন্ত-দিনের পড়ন্ত রোদ্দুরের কাছে। জন্ম দেয় অন্ধ-আলোর। কবিতার কথা ভাবতে বসলে মনে হয়, বাংলা কবিতার অশেষ বিবর্তন ঘটে গিয়েছে। কিন্তু দোল বা হোলির কবিতা কোথায়? একটি জনপ্রিয় বাংলা দৈনিক দোল সংখ্যা বার করত একটা সময়। পুজোসংখ্যার চাইতে আকারে খানিকটা শীর্ণ হত এই বিশেষ সংখ্যা। লিখতেন সেই সময়ের সেরা লেখকরা। পুজোসংখ্যার গ্ল্যামারের বাইরে বাঙালিকে আর-একবার তার সারস্বত ঐতিহ্যকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার সেই উদ্যোগ কিন্তু বহুদিন ধরেই লুপ্ত।

একটা কথা থেকেই যায়। বসন্ত-দিনের কী হল? সে কেন কবিতায় ফেরাল না বাঙালির স্মৃতিকে? বসন্ত উৎসব কেন 'দোল'-এর চেহারায় থমকে থাকল তরুণ মজুমদারের তোলা রুপোলি পরদায়? 'হোলি' হয়ে কেন সে উপচে উঠল না মধ্যবিত্ত বঙ্গজনের পরিসরে? আটের দশকে ডুয়ার্সের আনাচকানাচে 'দোল'-এর প্রতিশব্দ ছিল 'হোলি'ই। আবিরের গুঁড়ো রোমাঞ্চ নয়, হোলি ছিল বোম্বাই ফিল্মের ছাঁদে। যে কোনও বসন্ত উৎসবে ডুয়ার্সের জনপদগুলির চেহারা দাঁড়াত 'শোলে' ছবির রামগড়ের মতো। পিচকারি, বাঁদুরে রঙের পাশাপাশি পকেট থেকে বেরত কাচের ছোট্ট শিশি। দানা দানা গুঁড়ো ঝকমকি পাথরের মতো, একটু জল সহযোগে দু'হাতে চটপট ঘষে নিয়ে অন্যের মুখে-ঘাড়ে লেপটে দিলেই— লাইফ জিঙ্গালালা! তোলে কার বাপের সাধ্যি! আমাদের মতো অর্বাচীনদের হাতে থাকত কুমকুম। মোমের ছাঁচে তৈরি

ছবি: সায়নি চন্দ

একরত্তি ডিমের সাইজের একটি বস্তু, যার মধ্যে সামান্য রঙের ঝিলমিল। দূর থেকে ছুড়ে মারা হত পথচারীদের। এতে রং লাগত সামান্য, ব্যথাই লাগত বেশি। কিন্তু সেই অস্ত্র নিয়েই ছিল আমাদের গেরিলা যুদ্ধ।

নাছোড়বান্দা রং ছিল মূলত তিনরকম—লাল, সবুজ, বেগুনি। সবুজ রংটা আজকের তৃণমূলি সবুজ নয়, অনেক বেশি গাঢ়। পরে জেনেছিলাম, এগুলোকেই বলে বাঁদুরে রং। এ ছাড়া কালোর কথা আলাদা করে বলতে হয়। কালো ছিল হেভি মেটাল। প্রত্যেক বছর কালো রঙের নতুন ভেরিয়েশন ইন করত। কোনওবার প্রেসের কালি, কোনওবার আলকাতরা, তো কোনওবার টাইপরাইটারের রিবন কালি। কালো রং নিষিদ্ধ হলেও কে শোনে কার কথা! যুদ্ধ আর দোলে নিয়ম বলে কিছু হয় নাকি! চার-পাঁচজন মিলে একজনকে টার্গেট করে অ্যাটাক করা হত। আত্মরক্ষার উপায় বলতে নিজের দশ আঙুল দিয়ে চোখ আর ঠোঁটকে আড়াল করা। সেই ট্যাকটিকস ব্যর্থ করে দিয়ে দাঁত অবধি রঙিন হয়ে উঠত লোকজনের। বাঁদুরে রঙের হাত থেকে বাদ যেত না কানের ফুটো বা নাকের ফুটোও। চুলের জন্য ছিল সোনালি বা রুপোলি উদ্ভাস।

এইসব উপকরণের প্রসাদে সেসব দিনে ডুয়ার্সের মফস্‌সল শহরগুলির দোলযাত্রা হোলির মদনোৎসবে রূপ নিত। ভদ্দরলোকের রং খেলা চুকেবুকে যেত বারোটার মধ্যে। তারপর চোলাই মদের গন্ধে, গাঁজার ধোঁয়ায়, বিহারি ঢোলের উপর অনভ্যস্ত বাঙালি চপেটাঘাতে যে দৃশ্যকল্প যেভাবে উথলে উঠত, তার তুলনা পাওয়া ভার। বেলা বারোটা থেকে রাস্তার দখল নিয়ে নিত পাড়ার কান-ঢাকা চুলের বচ্চনদের দল। দুপুরের নিঝুম গলিপথে প্রকৃত আকার পেত বসন্তোৎসব। কামদেব তাঁর ধনুকে ঘেঁটু ফুলের তির যোজনা করে নেমে আসতেন ধরাধামে। রং মাখানোর অছিলায় যা ঘটে যেত তা দেখলে বাৎস্যায়নের চোখ ছানাবড়া হয়ে যেত। কারা সেই মদনবহ্নির মহাযজ্ঞের শরিক হতেন, আজ আর সেসব সন্ধান করে লাভ নেই। মফস্‌সলের নিম্নমধ্যবিত্ত আর নিম্নবিত্ত পরিসরে দোলের বকলমে হোলিই ছিল চির-অন্তরিনা গৃহবধূ। আর বয়ঃসন্ধির মেয়েদের একটা অংশের লিবিডো চরিতার্থকরণের একমাত্র স্পেস। কবিতার রোমান্স থেকে বহু মাইল দূরে সেই মাংসল সত্যের জগৎ। কোনও রবীন্দ্র-গান, কোনও আবির-সৌন্দর্য তাকে ছুঁতে পারত না।

গ্রুপফি আর সেল্‌ফির এই সফিস্টিকেটেড যুগে দাঁড়িয়ে সেই ছবিগুলিকে জন্মান্তরের দৃশ্য বলে মনে হয়। এখন তো দোল কেউ খেলেই না। সেই রংও এখন বাজারে পাওয়া ভার। এখনকার রং ইকো-ফ্রেন্ডলি। গায়ে, চোখে লাগলে নো প্রবলেম। সাবানও দিতে হবে না, জল ঢাললেই গা থেকে গায়েব। এ রঙে সে রঙের মৌতাত কোথায়! কিছু কিছু স্মৃতির কোলাজ মনের ভিতর বাঁদুরে হয়ে লেপটে আছে, এই যা।

জলপাইগুড়ির 'আনন্দধারা' বেশ কয়েক বছর ধরে বসন্ত উৎসব যাপন করে আসছে এই শহরে। প্রথমবার জেওয়াইএমএ মাঠে হয়েছিল অনুষ্ঠান। তারপর থেকে টাউন ক্লাব ময়দানে চলছে বর্ণিল এই উৎসব। নাচ, গান, বাজনায় মুখরিত ঘণ্টা চারেকের তুমুল হইহই। মাঠের মধ্যে শহরের প্রায় সব নাচের দলের বালিকা আর কিশোরীরা পরিবেশন করে চলেছে নাচ। গতবার সপরিবার মাঠে গিয়ে দেখেছিলাম, স্টেডিয়াম কানায় কানায় পূর্ণ। ডিজে বাজছে দ্রুতলয়ে। চরাচর জুড়ে বেনীআসহকলা গুলাল উড়ছে হাওয়ায়। বসন্তের আগুন ছড়িয়ে পড়ছে বাতাসের প্রতি রন্ধ্রে, দিগ্‌দিগন্তরে। কলতানমুখরিত তরুণ-তরুণীরাই সংখ্যায় বেশি।

আবিরে আবিরে বর্ণময় মুখগুলোর দিকে তাকিয়ে ভাবছিলাম, এই কিশোরীবেলাতেই তো নবীন কিশোর ভোররাতের স্বপ্নে ডাক দিয়ে বলে যায়, চল যাই বসন্ত উৎসবে। দোল খেলি প্রাণভরে। ডাক দিয়েই হাওয়ায় মিলিয়ে যায় সে। কিশোররা বাঁচে না যক্ষপুরীর শক্ত মাটিতে। অথচ সেই স্বপ্নের গুঁড়ো রং শরীরে মেখে নেয় কিশোরী। লাল-হলুদ শাড়ি, রূপদস্তার গয়না আর পলাশ ফুলে নিজেকে সাজিয়ে স্বচ্ছ নীল আকাশের দিকে মুখ তুলে বলে, দেখতে পাচ্ছিস আমাকে? কেমন লাগছে রে? পূর্ণচন্দ্রের রুপোলি জ্যোৎস্নার মতো উজ্জ্বল স্বপ্নটুকুর রেশ থেকে যায় কিশোরীর দু'চোখের তারায়।

এখন সেভাবে চোখে পড়ে না, তবে তখন দোলপূর্ণিমার আগের দিন বুড়ির ঘর পোড়ানোর পর্ব থাকত ডুয়ার্সের অনেক জায়গায়। অনেকে বলত, নেড়া পোড়ানো। পাটকাঠি দিয়ে তৈরি হত বুড়ির ঘর। যত শুকনো পাতা আছে পাড়ার সমস্ত বাড়িতে, সব জড়ো করে এনে রাখা হয় বুড়ির ঘরে। শুনেছি, সেই বুড়ির ঘরে আগুন দেওয়ার আগে অনেক জায়গায় নাকি পুজো হত সেই বুড়ির। যেমন-তেমন নয়, রীতিমতো মন্ত্র পড়ে পুরোহিতের পুজো। এখনও অনেক বাড়িতে রাধা-কৃষ্ণর পুজো হয় দোলপূর্ণিমায়। দোলভিটে থাকে অনেক বাড়িতে। উঁচু তিন থাক বেদি। দোলমঞ্চ বলা হয় একে। রংবেরঙের কাগজ কেটে শিকল বানানো হয় পুজোর জন্য।

গ্রুপফি আর সেল্‌ফির এই সফিস্টিকেটেড যুগে দাঁড়িয়ে সেই ছবিগুলিকে জন্মান্তরের দৃশ্য বলে মনে হয়। এখন তো দোল কেউ খেলেই না। সেই রংও এখন বাজারে পাওয়া ভার। এখনকার রং ইকো-ফ্রেন্ডলি। গায়ে, চোখে লাগলে নো প্রবলেম। সাবানও দিতে হবে না, জল ঢাললেই গা থেকে গায়েব। এ রঙে সে রঙের মৌতাত কোথায়! কিছু কিছু স্মৃতির কোলাজ মনের ভিতর বাঁদুরে হয়ে লেপটে আছে, এই যা।

কোনও এক দিঘল দিঘল চোখের রাইকিশোরীর কাছে দোলের কোনও এক জাদুবাস্তবতায় মোড়া দিনে এক নবীন কিশোর গল্প শোনে মেয়েটির গ্রামের বাড়ির। সেখানকার ঠাকুরদালানে বহু বছর আগে রাধা-কৃষ্ণর প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। সেই থেকে প্রতি দোলপূর্ণিমায় এই পুজো হয়। পাল ঠাকুর এলে একটা ঘর ওঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়। দরজা বন্ধ করে সারারাত ধরে উনি মূর্তি গড়েন। এই সময় ওই ঘরে কারও প্রবেশ নিষিদ্ধ। ছোটরা উঁকিঝুঁকি মারে কৌতূহলী হয়ে। বকুনি খায় বড়দের। সকাল থেকে পুজো শুরু হয়ে যায়। গুরুজনদের পায়ে আবির দিয়ে প্রণাম করে ছোটরা। তার নাম রং-প্রণাম।

ডুয়ার্সে এখনও দোলের দিন আখড়ায় আখড়ায় ভেসে বেড়ায় তুলসীদাসি ভজন, বাউলের গান, পূজাপাঠ, পদাবলি কীর্তনের অনুষঙ্গ। এসব আছে বলেই তো এখনও দোলের দিন বেশিটাই প্রেম, বেশিটাই উৎসব। এখনও সে বাঁশি বাজে যমুনার তীরে। এখনও সদ্য প্রেমে পড়া উনিশ বছরের ছেলেটি অপেক্ষা করে থাকে এই দিনটির জন্য; দু'হাতে ফুলের রং নিয়ে। মেয়েটির গালে যে আবির ছুঁইয়ে দেবে, সেই স্পর্শে বুঝিয়ে দেবে সে মেয়েটিকে ভালবাসে। মেয়েটি যদি বুঝতে না পারে, সে বাড়ি ফেরার পথে বুকপকেটের চিঠিটা বার করে টুকরো টুকরো করে ভাসিয়ে দেবে হাওয়ায় হাওয়ায়। সারাজীবনের অপেক্ষাকে কোন রঙে সাজাবে, সেই সিদ্ধান্তহীনতার তীব্র দোলাচল বুকে পুষে, সমস্ত মন খারাপকে এক মুঠো আবিরের মতো হাওয়ায় উড়িয়ে দেবে ছেলেটি। পলাশ ফুলের পাপড়ি ছুঁয়ে ফিসফিস করে সেই নবীন কিশোর বলে উঠবে, সবহ প্রেমে রং লাগে না।

খুচরো ডুয়ার্স

ন রবি ন গৌতম

কী আশ্চর্য কাণ্ড রে ভাই! এসজেডি-এতে এই তো সে দিন একটা নয় দুটো নয়, পুরো আধ ডজন নয়া সদস্য নেওয়া হল, অথচ তার মধ্যে রবিবাবু আর গৌতমবাবুর কেউ নেই গো! সবাই নাকি সৌরভবাবুর! না হয় মানলুম যে, রবি থাকে কোচবিহারে। শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ির ব্যাপারে সে লোক দেবে কীভাবে? কিন্তু সে কি উত্তরবঙ্গের উন্নয়নের কর্তা নয়? এবার যদি রেগে গিয়ে উন্নয়নের প্রশ্নে সৌরভবাবুর লোকজনকে বুড়ো আঙুল দেখায়, তবে? আর গৌতমবাবু যে এদ্দিন এসব সামলালেন, তাঁর হাতে কি দু'-পাঁচটা কাজের লোক ছেলোনি? সব শুনে দলের অনেকে বলছে, রবি-সৌরভ-গৌতম এক হলে কি আর চিন্তা ছিল রে!

খাড়াকে কারা?

গোরুমারার ডন, গন্ডারাধিপতি খাড়া সিংকে সে দিন আহত অবস্থায় উদ্ধার করেছিল বন দপ্তর। এক পায়ে গভীর ক্ষত নিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল জঙ্গলে। তারপর ঘুম পাড়িয়ে, চিকিৎসা করে, মলম লাগিয়ে, অ্যান্টিবায়োটিক খাইয়ে খাড়া সিংকে খাড়া করার পর খটকা লেগেছে বনকর্তাদের। প্রথমে ভাবা গিয়েছিল, কোনও গন্ডার খাড়া সিংকে গুঁতিয়েছিল। কয়েক সপ্তাহ আগে গার্লফ্রেন্ড পাওয়ার পর সে দিন কাটাচ্ছিল ধূপঝোড়ায়। তাহলে কেউ কি খাড়া সিং-এর প্রেমিকাকে ছিনতাই করে পালিয়ে গিয়েছে? কিন্তু খটকা এইখানেই। খাড়া সিংকে গুঁতিয়ে বান্ধবী নিয়ে পালাবে এমন বুকের, থুড়ি শিঙের পাটা এলাকার আর কোন গন্ডারের আছে? তা ছাড়া, পায়ের ক্ষতটা দেখে ঘোরতর সন্দেহ যে, সেটা দেশি বন্দুকের গুলির কারণে হয়েছে। গন্ডার তো ভাই গুলি চালায় না! তাহলে? খাড়াকে কারা? তদন্ত চলছে।

জলে কালো

এই রে! ফরসা হওয়ার ক্রিমের কথা তো শুনেছি, কিন্তু কালো হওয়ারও কিছু আছে বলে তো জানতুমনে! তা বিচারকরাও

জানতেন না। শিলিগুড়িতে তাঁদের থাকার জন্য যে আবাসন বানিয়ে দেওয়া হয়েছিল, সেখানে পরিবার নিয়ে বসবাস করে ঠান্ডা মাথায় বিচারকর্ম নিয়ে ভাবনাচিন্তা করবেন বলে বেশ নিশ্চিন্তে ছিলেন তাঁরা। হঠাৎ দেখলেন যে কালো হয়ে যাচ্ছেন। কালো কালো ভুতুড়ে ছোপ পড়ে যাচ্ছে হাতে-পায়ে। জানা গেল, আবাসনে সরবরাহ করা পানীয় জল পান করেই কালো হচ্ছেন তাঁরা। কেষ্টবর্ণ ধারণের পাশাপাশি উদরাময় এবং কেশলোপও ঘটছিল। বিচারকের আবাসনের পানীয় জলের এত গুণ জেনে শিলিগুড়িবাসী কিঞ্চিৎ ঘাবড়ে গিয়েছেন। ঘেবড়ে যাওয়ার মতোই কথা কিনা।

এগজাম ফোর্স

দিনকালে পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে। আগে চাকরি পেলে লোকে জিজ্ঞেস করত, কত ঘণ্টা পড়েছেন? এখন পেলে বলে, কত দিয়েছেন? শিক্ষা-ফিক্ষা লাটে। স্কুলে গিয়েছি মানে পাশ করা আমার জন্মগত অধিকার। তাই রায়গঞ্জের প্রশাসন কোনও ঝুঁকি না নিয়ে মাধ্যমিকের আগে 'অ্যাকাডেমিক ওয়ার' ঘোষণা করে দিয়েছে। সশস্ত্র বাহিনী লেফ্‌ট-রাইট করা শুরু করে দিয়েছে। ঘরে ঘরে সিসি ক্যামেরা বসিয়ে জোর নজরদারি চালানো হবে 'চোথারু'দের বিরুদ্ধে। আমাদের প্রস্তাব, রাজ্যে একখানি 'এগজাম ফোর্স' বা 'সশস্ত্র পরীক্ষা সুরক্ষাবাহিনী' তৈরি করা হোক। পরীক্ষাগ্রহণ এখন ভোটগ্রহণের মতোই 'স্পর্শকাতর'। বুথ এবং পরীক্ষাকেন্দ্রের আর তফাত নাইকো!

টোটোবাড়ি

ছোট্ট জনপদ ওদলাবাড়িতে রাস্তাঘাট দখল করে শ'দেড়েক টোটো নাকি মহা জটিলতা সৃষ্টি করছে। এমনিতেই কোষাগার গড়ের মাঠ থাকার কারণে পঞ্চায়েতের পরিষেবা দিতে ঘেমে যাচ্ছেন প্রধান সাহেব। তদুপরি বেআক্কেলে টোটোবাহিনী যদি রাস্তাঘাট দখল করে পাবলিকের মেজাজ বিগড়ে দেয়, তবে ঝামেলার অন্ত থাকবে না। পয়সা নেই তাই উন্নয়ন নেই। না-হয় মেনেই নিলুম। কিন্তু টোটোদের বাড়বাড়ন্ত থামাতে কোন কেন্দ্রীয় বরাদ্দের দরকার, সেটা শুনি? প্রধান সাহেব বলেছেন যে, মেরেকেটে চল্লিশটা টোটো নাকি অনুমতি নিয়েছে। এক্সট্রা আরও একশো কীভাবে ঘুরছে, সেটা বোঝা যাচ্ছে না। তবে অচিরেই তিনি 'রণং দেহি' রূপ ধারণ করে মাঠে নামছেন। পাবলিক ফের টের পাবে যে, জায়গাটার নাম টোটোবাড়ি নয়কো, ওদলাবাড়ি!

সরস্বতীর পেঁচা

সরস্বতীর আঙিনায় লক্ষ্মী এলে কী হয় তা বিলকুল টের পাচ্ছে তুফানগঞ্জের নাককাটি উচ্চ বিদ্যালয়ের ক্লাস নাইন। সে ক্লাসঘরের সিলিং-এ বাসা বেঁধেছিল এক পেঁচা। এবার তিনি মা হয়েছেন। ছানাদের নিয়ে তোফা দিন কাটাচ্ছেন। ছানারাও আনন্দে পড়া শুনতে শুনতে পটি করে যাচ্ছে। ফলে ক্লাসঘরে বসা দায়। নাকে আঙুল চেপে ক্লাস করতে হচ্ছে নাককাটির নাইনে। বন বিভাগকে খবর পাঠানো হয়েছে পেচককুলকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। কিন্তু কেউ আসছে না। ফলে দিশেহারা ছাত্ররা বলছে, হাঁস হলে না-হয় পড়াশুনোর গুরুত্ব

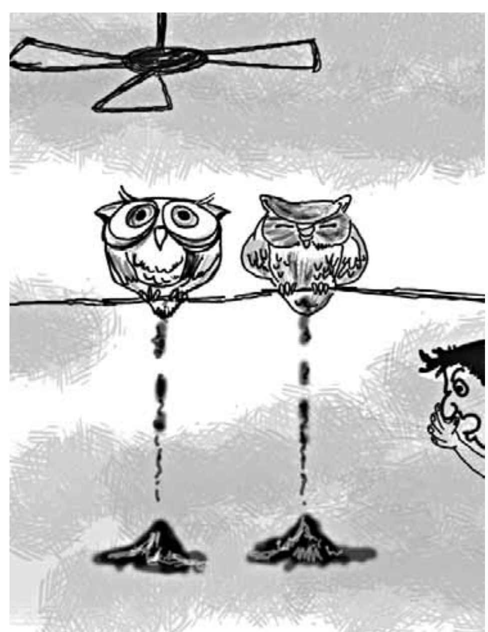

বুঝত, কিন্তু পেঁচা কি আর বোঝে? ফলে পেঁচা-পটি অব্যাহত। গন্ধাস্ত্রে কাতর নবম শ্রেণি।

গুরুং ফোঁস

কালিম্পংকে জেলা বানিয়ে জিটিএ-র বদলে দিদি যে গুরুংভাইকে পিটিয়ে দিলেন, সে কি বলার অপেক্ষা থাকে রে ভাই! গোর্খাল্যান্ডও যে কয়েক আলোকবর্ষ দূরে চলে গিয়েছে, সেটাও বিলকুল বুঝছে পাহাড়ের পাবলিক। সামনেই ভোট। ফলে উত্তেজিত বিমলবাবু বলে দিয়েছেন যে, জিটিএ চুক্তি তিনি পুড়িয়ে দেবেন। তারপর এমন চমকদার আন্দোলন শুরু করবেন যে, রোজ ভূমিকম্প হবে। শুনে ভাই ভয় লাগছে রে! বেশ ভাল যাচ্ছিল পাহাড়। লোকে আসছিল দল বেঁধে। সেসব আবার চৌপাট করে দিবিনে তো বাবা বিমল? তবে দিদি কিন্তু অ্যাক্টো বানিয়েছে। ভেঙেছিস কি গিয়েছিস। জরিমানা দিতে দিতে ফতুর না হয়ে যায় আবার দলটা। ফোঁস করার আগে ভাবিস ভাইটি।

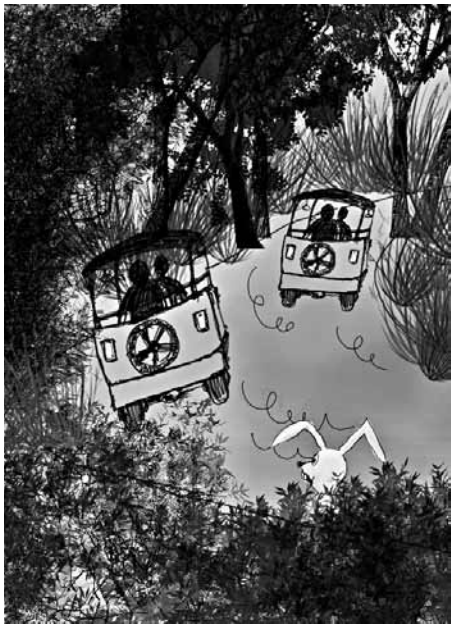

বেটার গ্রেটার

গ্রেটার কোচবিহারের লোকজন কিঞ্চিৎ বেটার অবস্থায় আসছেন বলেই তো মালুম হচ্ছে। সেই যে কোচবিহারে রেল অবরোধকাণ্ডের পর পুলিশের তাড়া খেয়ে তাঁরা ঝিমিয়ে গিয়েছিলেন, এবার সেটা কেটেছে। তবে গ্রেটার আবার দু'রকম। অনন্তপন্থী আর বংশীবদনপন্থী। নিন্দুকরা বলে যে, অনন্তবাবু অনেকদিন ধরেই ডুবে ডুবে পদ্মমধু খাচ্ছেন। ইদানীং বংশীবাবু ঘাসফুলে মুগ্ধ হচ্ছেন দেখে বিজেপি আর সইতে না পেরে সব 'খুলে আম' করে দিয়েছে। অনন্তবাবুর সভায় দলীয় নেতাদের পাঠিয়ে দিয়েছে তারা। উপনির্বাচনে ভোটের হিসেব কষে পঞ্চায়েত নির্বাচনে কোচবিহারে ফাটিয়ে দেওয়া ফল করার ব্যাপারে পদ্ম শিবির গা-ঝাড়া দিয়ে নেবেচে রে ভাই! গ্রেটার তো তাদের কাছে বেটার হবেই। অবশ্যি বিজেপি এসব উড়িয়ে দিয়ে বলেছে, ধ্যাৎ! গ্রেটার হল অরাজনৈতিক ব্যাপার। সভায় ডেকেছে তাই গিয়েছি। অরাজনৈতিক সংগঠন? আচ্ছা! মনে থাকবে!

থামান থামান

কী কাণ্ড শুনছি বলুন তো? লাটাগুড়ি থেকে চালসা অব্দি জঙ্গলের মাঝ দিয়ে যাওয়া রাস্তায় সন্ধে নামতেই নাকি শুরু হচ্ছে টোটো সাফারি। পর্যটকদের নিয়ে রাতের জঙ্গলপথে নিঃশব্দে ছুটছে তারা। মাঝে মাঝে জঙ্গলে ঢুকে পড়ছে। ভাবুন তো বুদ্ধির বহর! ওরে গোবরগণেশ! একবার যদি সামনে হাতি খাড়া হয়ে যায় কি তেড়ে আসে, বাইসন যদি ধাওয়া করে, তবে কী হবে ভেবেছিস? পালিয়ে বাঁচবি ওই টোটোয় চেপে? জানার পরে রেগে লাল হয়ে গম্মেন্টের লোক বলেছে, ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। আমরাও বলি, শিগগির, শিগগির নিন। অপোগণ্ড, অর্বাচীনদের থামান। পর্যটক না জিম করবেট!!!

টুক্রাণু

বিট অফিসার সমেত আধ ডজন লোককে গুঁতিয়ে কালামাটিতে কাণ্ড ঘটাল জোড়া বাইসন। মালদা স্টেশনে নকল জলে নাকাল ক্রেতা। ধূপগুড়িতে রোজ ভ্যালির বাগান থেকে দামি গাছেরা কোথায় জানি পালিয়ে যাচ্ছে। আলিপুরদুয়ারের দাবি, বুনো হাতিদের গুন্ডামি সামলাক জনপ্রতিনিধিরা। টানা অনাবৃষ্টিতে কি খরার খপ্পরে যাচ্ছে চা-বাগানগুলো? এখনও জেলা হল না দেখে ভারী দুঃখ ইসলামপুরের। জলাভাবে চাষ বন্ধ কামাখ্যাগুড়িতে। বোল্ডার ভাঙার জন্য নদীতেই যন্ত্র নামিয়ে ফেলেছে ডুয়ার্সের বোল্ডার মাফিয়ারা। ভালবাসার দিনে ডুয়ার্সে গোলাপের দাম শুনে বালকদের মনে বিরহবেদনা। বন বিভাগের রোপণ করা শিশু গাছ শৈশবেই পটোল তুলছে দেখে তদন্তের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়কে ডাকা হয়েছে। মালদায় এবার দুরন্ত আম হচ্ছে, কিন্তু লিচুর দেখা নাই। হেলিকপ্টারে চেপে আরও আধ ডজন বাঘ আসছে ডুয়ার্সে।

এখন ডুয়ার্স-এ বিজ্ঞাপন দিন

General Rates for Display Ads (INR)

Full Page, Colour:12,000
Full Page, B/W: 8,000
Half Page, Colour: 7,500
Half Page, B/W: 5,000
Back Cover: 25,000
Front Inside Cover: 15,000
Back Inside Cover: 15,000
Double Spread: 20,000

Special Rates for Local Trade only

Strip Ad, Colour: 6,000
Strip Ad, B/W: 4,000
1/4 Page Ad, Colour: 2,500
1/4 Page Ad, B/W: 1,500
1/6 Page, Colour: 1,500
1/6 Page, B/W: 1,000

Mechanical Details: Full Page Bleed {19.5cm (W) X 27 cm (H)}, Non Bleed {16.5cm (W) X 23 cm (H)}, Half Page Horizontal {16.5cm (W) X 11.2 cm (H)}, Vertical {8 cm (W) X 23 cm (H)}, Strip Ad Vertical {5cm (W) X 23 cm (H)}, Horizontal 16.5 cm (W) X 7.5 cm (H), 1/4 Page 8 cm (W) X 11 cm (H), 1/6 Page {5cm (W) X 11.2 cm (H)}

Rates are effective from April 1, 2016 issue

বিজ্ঞাপন দিতে বা বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন
কলকাতা ৯৯০৩৮৩২১২৩
উত্তরবঙ্গ ৯৪৩৪৪৪২৮৬৬

এখন ডুয়ার্স

কালিম্পং-এর পর শিলিগুড়িকেও পৃথক জেলা করার দাবি উঠতে বাধ্য

১৪ ফেব্রুয়ারি পশ্চিমবাংলার মানচিত্রে যুক্ত হল আরও একটা নতুন জেলা— কালিম্পং। আমাদের দেশের রাজনৈতিক আঙিনায় ফ্যাশন প্যারেড বা একেক সময় একেক দেব বা দেবীর পূজার হাওয়া ছড়িয়ে পড়ার মতো এক-একটা হুজুগ দেখা যায়। এখন শুরু হয়েছে জেলা গঠনের হুজুগ। মুশকিলটা যে অন্যখানে। আমাদের সংবিধান রাজ্য ভেঙে অপর একটি রাজ্য গঠনের স্বীকৃতি দিলেও, একটা রাজ্য গঠনের জন্য যেমন ন্যূনতম কী প্রয়োজন, তার কোনও ব্যবস্থাপত্র বলা হয়নি, তেমনি একটা জেলা ভেঙে অপর একটা জেলা গঠনের জন্য কোনও বিধি বা প্রয়োজনীয় শর্তের কথাও কোথাও জানানো হয়নি। এগুলির সিদ্ধান্ত পুরোপুরি রাজনৈতিক। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে একেক রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির দল ক্ষমতায় আসতে পারে এবং আসেও। তাই রাজ্য পুনর্গঠনে নতুন একটা রাজ্য গঠন বা জেলা ভেঙে একটা নতুন জেলা গঠন রাজনৈতিক আসনে যে দল এসে ক্ষমতায় বসে তা তাদের রাজনৈতিক ভাবনা ও স্বার্থের কথা ভেবে নেয়। প্রশ্ন হচ্ছে, এই ভাঙার শুরু থেকে শেষ কোথায়?

একই ভাবনায় গঠিত হচ্ছে নানা জাতি তথা গোষ্ঠীগত উন্নয়ন পর্ষদ— লেপচা উন্নয়ন পর্ষদ, তামাং উন্নয়ন পর্ষদ ইত্যাদি। যুক্তি, সেই এলাকার সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতি বা গোষ্ঠীর চাপে, তারা যাতে নিজেদের নিরাপত্তাসহ তাদের সংস্কৃতির উন্নয়ন বজায় রাখতে পারে। তাদের সাহায্য করতেই এই গোষ্ঠীগত উন্নয়ন পর্ষদ গঠন।

এক প্রাক্তন সাংসদ উত্তরবঙ্গের রাজনীতির আঙিনার বাইরেও তিনি তাঁর প্রজ্ঞার গুণে সবার কাছে এবং সব দলের কাছেই পরম শ্রদ্ধার ব্যক্তিত্ব বলে গণ্য হন। কিছুদিন আগে তিনি এক আলোচনাসভায় ব্যক্তিগত স্তরে এই প্রতিবেদককে বলেছিলেন, তিনি অতি সম্প্রতি দার্জিলিং পাহাড়ে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি দেখেছেন, বাঙালিরা অতি দ্রুত সেখানে সংখ্যালঘু থেকে লঘুতর হয়ে পড়ছে। দার্জিলিঙের সৃষ্টিকাল থেকেই বা বহু বছর ধরে সেখানে বসবাসকারী বাঙালিরা দার্জিলিং থেকে তাঁদের দীর্ঘ দিনের বসতবাড়ি ও ব্যবসা গুটিয়ে সমতলে নেমে এসেছেন। সেখানে বাঙালিদের সঙ্গে সংখ্যাগরিষ্ঠ নেপালিদের মধ্যে কোনও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেনি। অথচ তাঁরা সেখানে মানসিকভাবে আর নিজেদের নিরাপদ ভাবতে পারছেন না। প্রবীণ সেই প্রাজ্ঞ রাজনৈতিক বন্ধুটির তাই প্রশ্ন, সংখ্যাগরিষ্ঠদের দাপটের হাত থেকে মানসিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের রক্ষাকবচ রূপে বিভিন্ন সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীগুলির জন্য যদি উন্নয়ন পর্ষদ গঠন করা হয়, তবে পাহাড়ের সংখ্যালঘু বাঙালিরা যদি এখন সেখানে উন্নয়ন পর্ষদের দাবি তোলে, তাকে সম্প্রদায়গত ভাবনা বলে বিরোধিতা করার যুক্তি খুঁজে পাওয়া অত্যন্ত কঠিন হবে। ইতিমধ্যেই তো সংখ্যালঘু— এই যুক্তিতে পাহাড়ে খ্রিস্টান ও মুসলিম সম্প্রদায় তাদের জন্য উন্নয়ন পর্ষদের দাবি তুলেছে।

ওই প্রবীণ রাজনৈতিক বন্ধুটির প্রশ্নটি কিন্তু এক কথায় ফেলে দেওয়া যায় না। এক গোষ্ঠী-ভাবনার প্ররোচনা আরেক গোষ্ঠী-ভাবনাকে উসকে দেয়।

পাহাড়ের দখলদারি জারি

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কতবার পাহাড়ে এলেন তা জানতে বা জানাতে তাঁকে হয়ত তাঁর আমলাদের সাহায্য নিতে হবে। তবে আরেকজন হয়ত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই পাহাড়ের সফরের সংখ্যাকে সঙ্গে সঙ্গেই বলে দিতে পারবেন। তিনি আজকের মুখ্যমন্ত্রীর পূর্বসূরি মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। একসময়ে মার্কসবাদী দলের পূর্ণ কর্তৃত্বের পাহাড়ে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বহুবার উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রবেশদ্বার শিলিগুড়িতে এসেছেন। কিন্তু বাম-মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যর গাড়ি বাগডোগরা বিমানবন্দর থেকে জাতীয় সড়ক ধরে দার্জিলিং মোড়ে এসে এত সশস্ত্র নিরাপত্তারক্ষী পরিবৃত্ত হয়েও তাঁর গাড়ির স্টিয়ারিংকে কোনওবারেই বাঁ দিকে ঘোরাবার কথা বলতে পারেননি। বাঁ দিকের রাস্তা যে সোজা চলে গিয়েছে দার্জিলিং পাহাড়ে। অথচ কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সদস্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখনই পাহাড়ে এসেছেন, সমতলের দেয়ালে তাঁর আগমনকে বিচ্ছিন্নতার প্রশ্রয় বলে বিরোধিতা করে তাঁর দল ভরিয়ে দিয়েছে। মজার কথা, একদিনের সাংসদ তথা বিধায়কসহ বলতে গেলে প্রায় সর্বত্র একচ্ছত্র কর্তৃত্বের অধিকারী সিপিএম-এর সেই পোস্টারবাহিনীর বীর সৈনিকরাও কিন্তু দার্জিলিং মোড়ের বাঁ দিক বা শালুগাড়া পার হয়ে সেবক পর্যন্ত আসতে সাহস করত না। অপর পক্ষ যখন বুঝে যায়, তার প্রতিপক্ষ তাকে ভয় পেতে শুরু করেছে, তখন প্রতিপক্ষ হয় আরও আক্রমণমুখী। আর অপর পক্ষ মানসিকভাবে আরও দুর্বল হতে শুরু করে। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য মুখ্যমন্ত্রী হয়েও দার্জিলিং পাহাড়ে যখন যেতে সাহস করেননি, সেখানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কতবার পাহাড়ে গিয়েছেন, তার হিসেবটা যে তাঁরই নজরে আছে— এটা হলফ করে বলা যেতে পারে।

অতীতের কালিম্পং

কালিম্পং শব্দটি লেপচা শব্দ। এটি এসেছে কালেমপুং থেকে। লেপচা ভাষায় 'কা'-এর অর্থ আমরা। 'লেম' কথাটির অর্থ খেলা করি। 'পুং'-এর অর্থ শৈলশিরা। অর্থাৎ কালিম্পং শব্দটির অর্থ দাঁড়ায় 'যে শৈলশিরায় আমরা খেলা করি।'

কালিম্পং সম্পর্কে এখনও পর্যন্ত যে প্রাচীনতম গ্রহণযোগ্য ইতিহাস পাওয়া যায়, সেটা হল ১৮৬৬ সালের। 'ভুটান অ্যান্ড দ্য স্টোরি অব ডুয়ার্স'-এর প্রতিবেদনে। সেখানে কালিম্পংকে একটা ক্ষুদ্র পাহাড়ি গ্রাম বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এল এ ওয়াডেল (১৮৯৯) কালিম্পঙের অর্থ বলতে বলেছেন, 'দ্য গভর্নর ফোর্ট'। তাঁর মতেও এটি একটি লেপচা শব্দ। অপর দিকে ও ম্যালি কালিম্পং শব্দটিকে তিব্বতীয় শব্দ বলেছেন। তাঁর মতে, এই শব্দটির অর্থ,

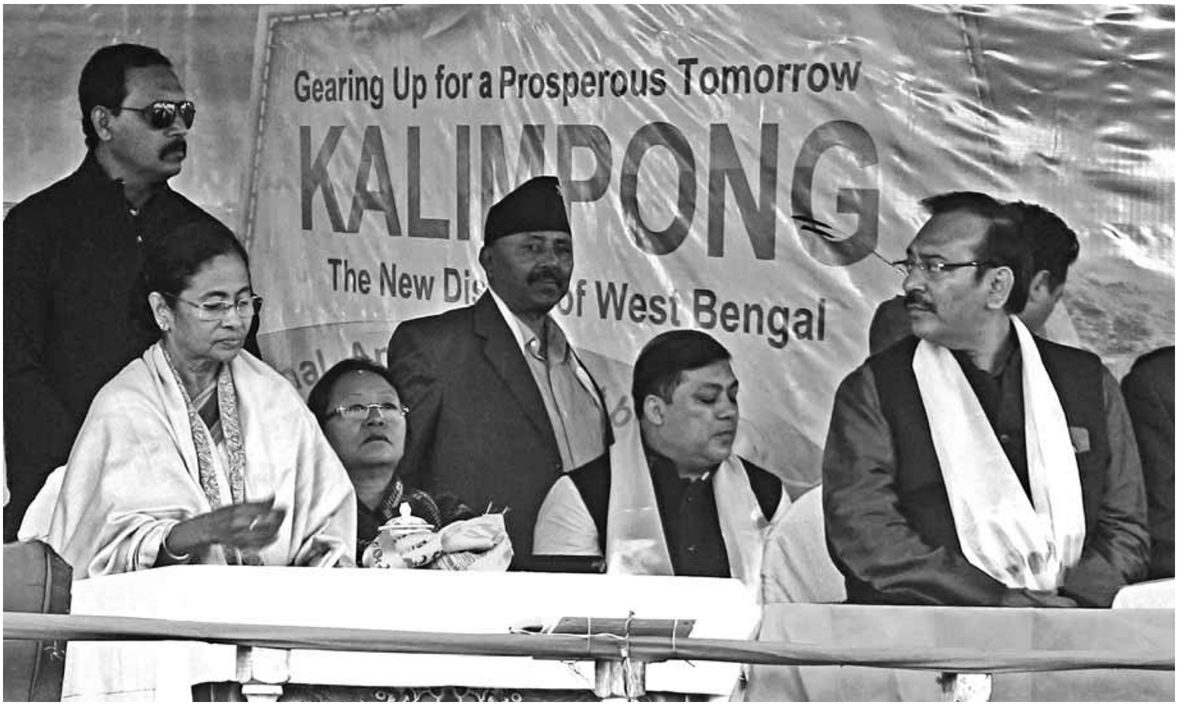

রাজার মন্ত্রীর বাঁশ বা কাঠ দিয়ে ঘেরা সীমানা। তিনি জানিয়েছেন, এটি ছিল ভুটান সরকারের এক প্রাদেশিক শাসকের প্রধান দপ্তর।

লেপচা বিশেষজ্ঞ আর্থার ফোনিং ম্যালি ও ওয়াডেলের এই ব্যাখ্যাকে মানতে রাজি নন। তাঁর মতে, এটি ছিল ভুটান শাসিত অঞ্চল। ভুটানের রাজপ্রতিনিধিরা যখন এখানে রাজস্ব আদায়ের জন্য আসত, তখন তাদের মনোরঞ্জনের জন্য এখানে নাচ-গানসহ শিকার ও খেলাধুলার আয়োজন করা হত। কালক্রমে এই শৈলভূমিই লেপচাদের বাৎসরিক উৎসবের ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল।

এখানেও একটি তথ্যের ভুল থেকে গিয়েছে। কালিম্পং এলাকাটি ছিল সিকিমেরই অংশ। ১৭০৬ খ্রিস্টাব্দে দুর্বল সিকিমের শাসককে হারিয়ে এটির দখল নেয় ভুটান। ১৮৬৫ সালে ভুটান ও ইংরেজদের মধ্যে যুদ্ধের সন্ধি চুক্তির ফলে এই এলাকাটি সহ পাহাড়ের পাদদেশ পর্যন্ত ইংরেজ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। তখন এর নাম ছিল আঠারোদুয়ার। এটিকে দার্জিলিং জেলার সঙ্গে যুক্ত করে দুটো মহকুমা গঠন করা হয়— দার্জিলিং এবং কালিম্পং। ১৮৯১ সালে দার্জিলিং শহর থেকে কার্শিয়াংকে পৃথক করে গঠন করা হয় কার্শিয়াং মহকুমা।

একটা ছোট্ট জেলাকে এমন খণ্ডীকরণ কেন?

পৃথক গোর্খাল্যান্ড রাজ্য গঠনের দাবির পিছনে এই ক্ষুদ্র পার্বত্য এলাকায় বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতির প্রয়োজনে যে নানা জাতির আগমন ঘটেছিল, তাদের মধ্যে এক পার্বত্য জাতিসত্তার গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। যেমন ইংরেজ রাজত্বকালেই প্রায় ৬০০টি রাজ্যসহ ভারতের নানা ভাষী ও ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ভিন্নতার মধ্যেও স্বাধীনতার দাবিতে একটি জাতিসত্তা গড়ে উঠেছিল— ভারতীয় জাতীয়তাবোধ। ইংরেজ শাসকরা জানত, এই ভারতীয় জাতীয় সত্তা তথা ভারতীয় ভাবনা দানা বাঁধলে তাদের হাত থেকে এই দেশের শাসনক্ষমতা বেরিয়ে যাবে। তারা তাদের সাম্রাজ্যকে ধরে রাখার প্রয়োজনে বিভেদের বীজকে সিঞ্চন করে রাখত। কখনও সেই বিভেদের বীজ হত ধর্মীয় বিভাজনের বীজ। কখনও হত ভাষাগত বিভাজনের বীজ। কখনও বা হত জাতিগত বা প্রাদেশিকতার বিভেদের বীজ।

আমাদের তো ভুলে যাবার কথা নয় ১৯০৫ সালের জুলাই মাসে লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গ বিভাজনের ইতিহাসের কথা। সেই বিভাজনকে এড়ানো যেত কি না, সেই তর্ককণ্টকিত রণভূমিতে এই প্রতিবেদনে প্রবেশের ইচ্ছে বা সুযোগ নেই। তবে উন্নয়ন পরিষদ গঠন করে সামগ্রিকভাবে পাহাড়ি এক জনসত্তার বিকাশের ভাবনাকে খণ্ডীকরণ করে আপাতভাবে গোর্খাল্যান্ড রাজ্য গঠনের পিছনে যে এক ঐক্যবদ্ধ পার্বত্য জনজাতির সত্তা গড়ে উঠছিল, তাকে থামানো গেলেও এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান হয়ে গেল এমন কথা অভ্রান্ত প্রত্যয়ের সঙ্গে ঘোষণা করা মনে হয় যুক্তিসংগত হবে না।

যে বাঙালি হিন্দুসমাজ সিপাহি বিদ্রোহের বিরোধিতা করে ইংরেজ কোম্পানির পক্ষে দাঁড়িয়েছিল, তারাই মাত্র ৫০ বছরের মধ্যেই ইংরেজ শাসনের বিরোধিতায় দেশের জাতীয়তাবাদে এমন নেতৃত্ব দেবে, ইংরেজ শাসক ভাবতে পারেনি। তারা বঙ্গভঙ্গ করেও বাঙালি জাতিসত্তাকে ধ্বংস করতে পারেনি—

বিহার, ওড়িশা, আসাম ও বাংলা ছিল একই প্রশাসনের অধীন। ১৮৬৬ সালে ওড়িশার দুর্ভিক্ষকে মোকাবিলা করতে না পেরে তারা মনে করে, এত বড় অঞ্চলের প্রশাসনকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। তাই ভাগ হল প্রদেশে। যে বাঙালি হিন্দুসমাজ সিপাহি বিদ্রোহের বিরোধিতা করে ইংরেজ কোম্পানির পক্ষে দাঁড়িয়েছিল, তারাই মাত্র ৫০ বছরের মধ্যেই ইংরেজ শাসনের বিরোধিতায় দেশের জাতীয়তাবাদে এমন নেতৃত্ব দেবে, ইংরেজ শাসক ভাবতে পারেনি। তারা বঙ্গভঙ্গ করেও বাঙালি জাতিসত্তাকে ধ্বংস করতে পারেনি— এটা

পরবর্তীকালে নানা ঘটনাপ্রবাহেই প্রমাণিত হয়েছে। ১৯০৫ পারেনি। কিন্তু মাত্র ৪২ বছরের মধ্যেই সেই বাঙালি-হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের অনৈক্য সমাজমানসে বিপন্নতার কালো মেঘের কাছে আত্মসমর্পণ করলেও, ১৯৭১ সালে এক ভয়াবহ আত্মত্যাগের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিরা স্বাধীন বাংলাদেশ গঠনের মধ্যে দিয়ে বাঙালি জাতিসত্তার পরিচয় রেখেছে। সেটাই সত্যি।

তবে শিলিগুড়ির দাবি অযৌক্তিক কেন?

এই দাবি এর আগেই উঠেছিল। এখন কিন্তু এই দাবিকে দমিয়ে রাখা মুশকিল হবে। এক বিভাজন আরেক বিভাজনের মুখ খুলে দেয়। শিলিগুড়ি এখন শুধুমাত্র একটা শহর নয়, মুখে মুখে প্রচলিত হয়ে গিয়েছে, এটি উত্তরবঙ্গের তথাকথিত রাজধানী। নামে এটি মহকুমা শহর হলেও মানসিক দিক থেকে শিলিগুড়ি ইতিমধ্যেই জেলা সদর দার্জিলিং থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছে। রাজ্য প্রশাসনও তা জানে। তাই সারা রাজ্যের জেলাগুলিতে যখন একটাই জেলা পরিষদ, সেখানে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদই রাজ্যের মধ্যে একমাত্র মহকুমা পরিষদ, যা জেলা পরিষদের সমমর্যাদা পায়। অন্য জেলাগুলির সদর দপ্তরে যে সমস্ত কাজ হয়, তার অধিকাংশই এখন দার্জিলিং জেলা দপ্তরের পাশাপাশি শিলিগুড়ি মহকুমার দপ্তরেও সম্পন্ন করা যায়। এক জেলায় দু'টি জেলা আদালত বিচারবিভাগীয় ব্যবস্থায় অনুমোদনযোগ্য না হলে জেলা আদালতে অনেক বিচার্য বিষয়ই মহকুমা আদালতের বিচারপতির অধিকারে দেওয়া হয়েছে। একই জেলায় দু'জন এসপি সম্ভব নয়। তাই শিলিগুড়িতেই স্থাপিত হয়েছে পুলিশ কমিশনারেট।

শিলিগুড়ি রাজ্যের তৃতীয় বৃহত্তম, কলকাতা ও হাওড়ার পরে জায়গা করে নিয়েছে। এখান থেকে সারা ভারতের সঙ্গে রেল, বিমান ও সড়কপথে যোগাযোগ করা যায়। আছে বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ, ল কলেজ, রেডিয়ো স্টেশন এবং শহর সংলগ্ন দূরদর্শন কেন্দ্র। শিলিগুড়ি মহকুমার চারটি ব্লক— মাটিগাছা, নকশালবাড়ি, খাড়িবাড়ি, ফাঁসিদাওয়া। এ ছাড়া এর সঙ্গে যুক্ত আছে ভক্তিনগর ও এনজেপি থানা। লোকসংখ্যা ১৫ লক্ষের মতো।

অপর দিকে, কালিম্পং মহকুমার তিনটি ব্লক— কালিম্পং, গোরুবাথান ও জলঢাকা। এর লোকসংখ্যা ছ'লক্ষের কিছু বেশি। অর্থাৎ শিলিগুড়ি মহকুমার জনসংখ্যার অর্ধেকের

রাজ্যের নতুন জেলা কালিম্পং

নতুন কালিম্পং জেলার আয়তন ১০৫৬ বর্গকিলোমিটার। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এর উচ্চতা ৪১০১ ফুট উঁচুতে। দার্জিলিং জেলা থেকে ভাগ হয়ে তৈরি হল রাজ্যের ২১তম এই নতুন জেলা। এর নতুন জেলাশাসক হয়েছেন ডঃ বিশ্বনাথ আর নতুন পুলিশ সুপার হয়েছেন অজিত সিং যাদব। এই নতুন জেলার মহকুমা একটি, জেলা সদর কাম্পিং। পুরসভাও একটি, কালিম্পং। ব্লক তিনটি। কালিম্পং ব্লক এক ও দুই, আর গোরুবাথান ব্লক। কালিম্পং এক-এর অধীনে ১৮টি গ্রাম পঞ্চায়েত, কালিম্পং দুইয়ে ১৩টি ও গোরুবাথান ব্লকে ১১টি গ্রাম পঞ্চায়েত। সব মিলিয়ে ৪২টি গ্রাম পঞ্চায়েত। তিস্তা নদীর ধারে কালিম্পঙের জলবায়ু একেবারে অন্যরকম। তিস্তা নদী একে প্রতিবেশী রাজ্য সিকিম থেকে আলাদা করেছে। শৈলশহর দার্জিলিঙের বিকল্প হিসেবে ব্রিটিশরা এই শৈলশহরের দিকে নজর দিয়েছিলেন অন্যরকম আবহাওয়ার কারণে, যাতে গ্রীষ্মে কালিম্পঙে সময় কাটানো যায়।

এই নতুন কালিম্পং জেলার রয়েছে অনেক ঐতিহ্য। কালিম্পঙের রয়েছে অনেক লড়াইয়ের ইতিহাস। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কালিম্পং ও সংলগ্ন এলাকা ছিল সিকিম ও ভুটান শাসনাধীন। ইতিহাসবিদরা বলেন, সিকিমের শাসনে থাকার সময় এর নাম ছিল ড্যালিং কোটলা। ১৭০৬ সালে ভুটান রাজা সিকিমরাজের সঙ্গে যুদ্ধ করে এই কালিম্পকে ছিনিয়ে নেন। তখন ভুটানরাজই এর নাম দেন কালিম্পং। ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে ইঙ্গ-ভুটান যুদ্ধ হয়। ব্রিটিশরা ভুটান রাজ্যের সঙ্গে যুদ্ধ করে জয়ী হলে একটা চুক্তি হয় ভুটানরাজের সঙ্গে। সেই চুক্তির নাম 'সিঞ্চুল্লার চুক্তি'। তা হয়েছিল ১৮৬৫ সালে। সেই চুক্তি অনুযায়ী স্থির হয়েছিল, তিস্তা নদীর পূর্ব দিকের ভুটান অধিকৃত অঞ্চলগুলো ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়ার আওতাভুক্ত হবে। অ্যাংলো-ভুটান যুদ্ধের পর কালিম্পং পশ্চিম ডুয়ার্স জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়। তখন কালিম্পঙে সামান্য দু'-তিনটি পরিবারের বসবাস। পরবর্তীতে ১৮৬৬ সালে এই কালিম্পং দার্জিলিং জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়। অবস্থানগত কারণেও কালিম্পঙের বেশ গুরুত্ব রয়েছে। এর কাছেই তিব্বত। কালিম্পঙের কাছেই চিন-তিব্বত সীমান্ত নাথুলা, যা এখন সিকিমের অধীন। আর কালিম্পঙেই রয়েছে জালেপলা সীমান্ত। একসময় এই সীমান্ত দিয়ে ভারত-চিন বাণিজ্য হত। ১৯৫২ সালে চিন-ভারত যুদ্ধের পর জালেপলা সীমান্ত দিয়ে বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যায়। কালিম্পঙের গায়েই রয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনীর ২৭ মাউন্টেন রেজিমেন্ট।

বহু লড়াইয়ের জেলা এই কালিম্পং এতদিন ছিল দার্জিলিং জেলার একটি মহকুমা। এই মহকুমার বহু প্রত্যন্ত গ্রাম রয়েছে। দুর্গম সেইসব পাহাড়ি গ্রাম থেকে জেলা সদর দার্জিলিং পৌঁছাতে বহু বাসিন্দার সারাদিন, এমনকি কোনও কোনও স্থান থেকে দার্জিলিং যেতে দেড় দিন-দু'দিন সময় লেগে যেত। ফলে উন্নয়নের দিক থেকে পিছিয়ে পড়ছিল কালিম্পঙের বহু এলাকা। সেখানকার প্রাক্তন বিধায়ক তথা জন-আন্দোলন পার্টির প্রধান ডঃ হরকাবাহাদুর ছেত্রী দাবি করেন, তিনি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে বেশ কয়েকবার উন্নয়নের স্বার্থে কালিম্পংকে জেলা হিসেবে ঘোষণার প্রস্তাব দিয়েছেন। অবশেষে মুখ্যমন্ত্রী তা বাস্তবায়িত করাতে মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন হরকাবাহাদুর।

জন্মলগ্ন থেকেই বহু রক্তপাত, সংগ্রামের ইতিহাস রয়েছে কালিম্পঙের। ভুটানরাজের সঙ্গে সিকিমরাজের যুদ্ধ বা ভুটানরাজের সঙ্গে ব্রিটিশদের যুদ্ধ বাদ দিলে আটের দশকে সুভাষ ঘিসিঙের নেতৃত্বে যখন গোটা পাহাড় অগ্নিগর্ভ, সেই সময়ও কালিম্পঙে অনেক রক্ত ঝরেছে। একদিকে প্রয়াত গোর্খা নেতা সি কে প্রধান, অন্য দিকে ছত্রে সুব্বার নেতৃত্বে আলাদা রাজ্যের দাবিতে অনেক রক্ত ঝরিয়েছে কালিম্পং। সদ্য গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা প্রধান বিমল গুরুঙের নেতৃত্বেও কালিম্পং টানা বন্ধ, লড়াইয়ে প্রথম দিকেই ছিল। সেই কালিম্পং এখন নতুন জেলা। মোর্চার একদা প্রথম সারির নেতা তথা সম্প্রতি তৃণমূলে যোগ দেওয়া নেতা প্রদীপ প্রধান বলেন, সুভাষ ঘিসিং বা বিমল গুরুং যা করতে পারেননি, কালিম্পঙের জন্য তা করে দেখিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এ এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত। এবারে কালিম্পঙের পিছিয়ে পড়া এলাকার উন্নয়নে গতি আসবে।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪ ফেব্রুয়ারি কালিম্পংকে নতুন জেলা হিসেবে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করে বলেন, এই জেলার পরিকাঠামো উন্নয়নে ৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। পানীয় জলের জন্য আলাদা প্রকল্প নেওয়া হচ্ছে। উন্নয়নের জন্য আলাদা অনেক কাজ হবে কালিম্পঙে। পর্যটকদের কাছে আরও আকর্ষণীয় করে তোলা হবে এই নতুন জেলাকে। বর্তমানে যেখানে জেলখানা রয়েছে, সেই জেলখানা অন্যত্র সরিয়ে তৈরি করা হবে একটি ম্যাল। দার্জিলিঙের ম্যালের ধাঁচে সেই নতুন ম্যাল তৈরি হবে। এতে পর্যটকদের আকর্ষণ আরও বাড়বে।

কৃষিনির্ভর জেলা কালিম্পং। দার্জিলিঙের মতো সেখানে চা-বাগান নেই বললেই চলে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্যও বিখ্যাত কালিম্পং। সেখানে অর্কিড চাষ হয় ভাল। উদ্যানপালন সেখানে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ফুলের বাজারও দারুণ। নেপালিরা ছাড়াও আদিবাসী, লেপচা, লিম্বু, বহু তিব্বতি ও বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের বসবাস সেখানে। ২০০১ সালের জনগণনা অনুযায়ী সেখানকার জনসংখ্যা প্রায় পঞ্চাশ হাজার। শিক্ষার হার গোটা দেশের শিক্ষার হার থেকে অনেক বেশি। পুরুষদের শিক্ষার হার ৮৪ শতাংশ আর নারীশিক্ষার হার ৭৩ শতাংশ। গোটা ভারতে যা ৫৯.৫ শতাংশ।

দাবি ও পাল্টা দাবিতে মুখর হচ্ছে শিলিগুড়ি

নতুন জেলা নিয়ে কালিম্পং যখন আত্মহারা, তখন তার একসময়কার সহযোগী মহকুমা সমতল শিলিগুড়ি এবার নতুন জেলার দাবিতে সোচ্চার। আর শিলিগুড়িতে জেলা গঠনের দাবিতে আন্দোলন করার জন্য নানা কর্মসূচি নেওয়া শুরু করেছে বৃহত্তর শিলিগুড়ি নাগরিক মঞ্চ। মঞ্চের অন্যতম কর্মকর্তা আইনজীবী সুনীল সরকার যুক্তি দেন, কালিম্পঙে তিনটি থানা রয়েছে। সেখানে শিলিগুড়িতে ন'টি থানা রয়েছে। সাতটি শিলিগুড়ি মহকুমায় আর দু'টি শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান লাগোয়া ভক্তিনগর ও এনজেপি থানা। কালিম্পঙের জনসংখ্যা ২০০১ সালের গণনা অনুযায়ী ছিল প্রায় পঞ্চাশ হাজার। এখন তা লক্ষাধিক। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটানেই জনসংখ্যা দশ লক্ষ। শিলিগুড়ি মহকুমার অন্য এলাকা ধরলে জনসংখ্যা সব মিলিয়ে পনেরো লক্ষ। বহু ক্ষেত্রেই শিলিগুড়িকে 'ডিস্ট্রিক্ট' বলা হচ্ছে। যেমন শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতাল বলা হচ্ছে সরকারিভাবে, শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলা বলা হচ্ছে, শিলিগুড়ি টেলিকম ডিস্ট্রিক্ট বলা হচ্ছে। তবে তার পূর্ণাঙ্গ জেলা হতে দোষ কী? সুনীলবাবু বলেন, তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছেন শিলিগুড়ি জেলা গঠনের জন্য। এখন তার জবাবের অপেক্ষায় রয়েছেন। সুনীলবাবুদের আরেক সঙ্গী রতন বণিক বলেন, এখন শিলিগুড়ির প্রধান জেলা সদর দার্জিলিং। ফলে শিলিগুড়ি সমতলের বাসিন্দাদের সব কাজেই জেলা সদর দার্জিলিং যেতে হচ্ছে, বিশেষ করে আদালত ও জেলাশাসকের কাজে। ফলে তাঁদের হয়রানি বাড়ছে।

বাংলা ও বাংলা ভাষা বাঁচাও কমিটির সভাপতি ডাঃ মুকুন্দ মজুমদার অবশ্য বলেন, শিলিগুড়ি জেলা গঠনের দাবির যেমন তাঁরা বিরোধিতা করেন, তেমনই কালিম্পং জেলা গঠনেরও বিরোধিতা করেন। কারণ, এতে দার্জিলিং বাংলার মূলস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। দার্জিলিং হল বাংলার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। দার্জিলিং হল বাংলার সম্পদ। কাজেই শিলিগুড়ি জেলা গঠন মোটেই কাম্য নয় বলেই অভিমত মুকুন্দবাবুর। সুনীলবাবুরা অবশ্য বলেন, শিলিগুড়ি জেলা হলে দার্জিলিং মোটেই বিচ্ছিন্ন হবে না। বরং শিলিগুড়ি জেলা হলে পৃথক গোর্খাল্যান্ডের দাবির আন্দোলন আরও বিচ্ছিন্ন বা ধ্বংস হবে। কেননা কালিম্পং জেলা হওয়াতে গোর্খাল্যান্ডের দাবির যৌক্তিকতা বা আন্দোলন অনেকটা ভেঙে গিয়েছে। শিলিগুড়ি জেলা হলে তা আরও ভেঙে যাবে। বিশিষ্ট ভ্রমণ গবেষক রাজ বসু অবশ্য বলেন, জেলা না হয়েও শিলিগুড়ি অনেক অতিরিক্ত সুবিধা ভোগ করে। যেমন, শিলিগুড়িতে মেট্রোপলিটান পুলিশ রয়েছে, শিলিগুড়িতে কর্পোরেশন রয়েছে, যা অনেক জেলাতেই নেই। তা ছাড়া দার্জিলিঙের টয় ট্রেন বা দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের জন্য শিলিগুড়ির আলাদা গুরুত্ব রয়েছে। বহু ভাষা, বহু ধর্ম, বহু মত নিয়ে এই শিলিগুড়িসহ গোটা দার্জিলিং জেলা। এইরকম জেলা গোটা দেশে প্রায় নেই বললেই চলে। পাহাড়-সমতল মিলিয়ে এইরকম সুন্দর জেলা ভাগ করার যৌক্তিকতা রয়েছে বলে মনে করেন না রাজবাবু। অন্য দিকে, পাহাড়ে দিনরাত যিনি 'পৃথক রাজ্য গোর্খাল্যান্ড' বলে সবসময় হুংকার দিয়ে যাচ্ছেন, সেই বিমল গুরুং কালিম্পং জেলার ঘোষণা ও তাঁর দল ভেঙে কয়েক হাজার ছাত্র সংগঠনের কর্মীদের তৃণমূলে যোগদান দেখে কার্যত চুপচাপই রয়েছেন, অন্তত এই লেখা পর্যন্ত। তিনি জেলা গঠন নিয়ে আর নতুন করে কিছু বলছেন না। বরং গোর্খাল্যান্ডের দাবি জোরদার করবেন কাদের নিয়ে— এই প্রশ্নেই ভেবে চলেছেন। যিনি দিনরাত 'পাহাড়ে গোর্খাল্যান্ড' বলে কাঁপিয়ে তুলিয়েছিলেন কয়েক বছর আগে, বিগত সরকারের শাসকদলের রাজ্য সম্মেলন যাঁর হুংকারে দার্জিলিং থেকে রাতারাতি সরিয়ে আনতে হয়েছিল, যাঁর নেতৃত্বে পাহাড়ে শুধু বন্ধ আর বন্ধ দেখে পাহাড়বাসী পর্যটন ভুলে গিয়েছিলেন, যাঁর আন্দোলনে পাহাড়-সমতলে একটা অস্থির পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল ক'বছর আগে, সেই পাহাড় আজ শান্ত। শান্ত কালিম্পং। নতুন জেলা গঠনের খুশিতে সেবকের উপর তিস্তা বাঘ পুল আলোর মালায় সেজে উঠেছে। তিস্তা দিয়ে শান্ত, সুন্দর ঝরনার জল বয়ে চলেছে। কালিম্পঙের বৃদ্ধ অর্জুন তামাং তাই ভালবাসার দিনেই বললেন, 'আর চাই না রক্তের জল, আর চাই না সেই অন্ধকার দিনগুলো। বঞ্চনার কালিম্পং এখন দেখিয়ে দেবে পর্যটন দিয়ে। বঞ্চনার কালিম্পং এখন দেখিয়ে দেবে তার ফুল দিয়ে। সেই ফুলের সুবাস নিতে সবাই আসুন কালিম্পঙে।'

বাপি ঘোষ

কম। রাজস্ব আদায়ের প্রশ্নে কালিম্পঙের সঙ্গে শিলিগুড়ির রাজস্বের পার্থক্য এতটাই বেশি যে, কোনও তুলনা করাই চলে না। মনে রাখা দরকার, দুর্গাপুর, হাওড়া ইত্যাদির মতো বৃহৎ শিল্পসমৃদ্ধ নগরের রাজস্ব শিলিগুড়ি থেকে বেশি হলেও, শুধু খুচরো ও কিছু পাইকারি ব্যবসার মাধ্যমে এই শহর যে পরিমাণ রাজস্ব আদায় করে, তার পরিমাণ উত্তরবঙ্গর জেলাগুলি থেকে যে মোট রাজস্ব আদায় হয়, তার ৮০ শতাংশ— ফোসিনের সম্পাদক বিশ্বজিৎ দাস জানিয়েছেন।

প্রশ্নটা এখানে, কালিম্পংকে জেলা ঘোষণা করার পিছনে যুক্তিগুলি কী? প্রশাসনিক সুবিধার জন্য একটা জেলার মহকুমাকে একটা জেলায় রূপান্তরিত করা যেতেই পারে। যেমন মেদিনীপুরের মতো এত বিশাল এলাকাকে বা ২৪ পরগনার মতো বড় জেলাকে ভাগ করা নিয়ে কোনও বিতর্ক তোলার কারণ থাকতে পারে না। প্রশাসনের কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য এটা অবশ্যই প্রয়োজনীয় ছিল। একই কথা বলা চলে দিনাজপুর জেলাকে উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাতে ভাগ করার প্রসঙ্গেও। জলপাইগুড়ি থেকে আলিপুরদুয়ারকে পৃথক করে আলিপুরদুয়ার জেলাতে রূপান্তরিত করার ক্ষেত্রেও কোনও আপত্তির কারণ নেই। এদের প্রতিটির বিশাল জনসংখ্যা, সদর শহর থেকে ভৌগোলিক দূরত্ব, জেলা গঠনের পরিকাঠামো ইত্যাদি উপাদান বিবেচনার মধ্যে এসেছিল। কিন্তু কালিম্পংকে জেলা ঘোষণা করার পিছনে যে রাজনৈতিক স্বার্থ ছাড়া অন্য কোনও যুক্তি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

গোর্খা জনজাতি মোর্চার কর্তৃত্বকে বিভাজন করতে এই দলেরই এক প্রতিষ্ঠিত নেতাকে পাহাড়ের বিকল্প নেতা রূপে প্রতিষ্ঠা দিতে তাঁর জন্মভূমি কালিম্পংকে দার্জিলিং থেকে বিচ্ছিন্ন করে একটা পৃথক জেলা গঠন করাই যদি কারণ হয়, তবে কিন্তু এই বিভাজন লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গের কথাই মনে করিয়ে দেয়। শিলিগুড়ি মহকুমাকেও কোন যুক্তিতে দার্জিলিং থেকে পৃথক করে একটা নতুন জেলার মর্যাদা দেওয়া হবে না, তা এখন শিলিগুড়ি মহকুমার অধিবাসীরা জানতে চাইতেই পারেন। রাজ্য সরকার এই প্রসঙ্গে কোনও যুক্তি হাজির না করে মৌনব্রত পালনকেই বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করছে। তাহলে যে কালিম্পংকে জেলা করার যুক্তিগুলিও দিতে হয়। সরকার যাবে ও আসবে। নেতাও যাবেন, আসবেন নতুন নেতা। কিন্তু বেঁচে থাকার সংহতি, তার বিনিময়ে রাজনীতির স্বার্থে যদি এই বিভাজন হয় তা বিপর্যয় আনতে পারে।

সৌমেন নাগ

শোষণ অব্যাহত, ক্যাশলেস মজুরির চূড়ান্ত অব্যবস্থা চা-শ্রমিকের মরার উপর খাঁড়ার ঘা

‘এখন ডুয়ার্স’-এর পক্ষ থেকে চায়ের ডুয়ার্সের কোণে কোণে ঘুরে তুলে আনা জ্বলজ্যান্ত ছবি পেশ করছেন **ভীষ্মলোচন শর্মা** তাঁর ধারাবাহিক প্রতিবেদনের **একাদশ পর্বে**।

এবারের সংখ্যার লেখার জন্য ডুয়ার্স সফরে গিয়ে একটা অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হল। ‘এখন ডুয়ার্স’-এর সম্পাদকমশাই লেখার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ছবি চান। ফলে সবসময়ের জন্য ক্যামেরাকে সঙ্গী করা প্রয়োজন। এদিকে, ক্যামেরা আমার একটু বড়সড়ো। ব্যাগ থেকে বার করা, খোলা-বন্ধ, ছবি তোলা, লেন্স সেট করা, ব্যাগে ক্যামেরাবন্দি করা বড় ঝক্কি। ফলে সম্প্রতি ক্যামেরা হাতে নিয়ে এবং সময়ে সময়ে কাঁধে নিয়ে চা-বলয়ে প্রবেশ করতে হচ্ছে আমাকে। আর এখানেই হয়েছে বিপত্তি। এমনিতে আমি যে ক্ষেত্রসমীক্ষা করি, তাতে অনেক সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। আমার পোশাক-আশাক, চেহারা, কথাবার্তার মধ্যে শহুরে টান থাকায় চা-বাগিচার নিজস্ব সংস্কৃতির আস্বাদ পেতে আমাকে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়। শ্রমিকরা প্রথম প্রথম মুখ খুলতে চায় না, অনেকে আছে, যারা তাদের নিজস্ব ভাষা ছাড়া বাংলা, ইংরেজি বা হিন্দিতে সড়গড় নয়। এবারে যখন নয়াসাইলি চা-বাগানে ঢুকছি বা রেড ব্যাঙ্কে ঢুকছি, তখন দেখি অনেকেই কীরকম সন্দেহের চোখে চাইছে ক্যামেরাটা দেখে এবং সত্যিই তা-ই, এই যন্ত্রটার জন্যই আমি রেড ব্যাঙ্ক, গ্যান্দ্রাপাড়া, লঙ্কাপাড়া, নয়াসাইলি, মোগলকাটা, বানরহাটে কোনও কাজই করতে পারলাম না। কারণ ক্যামেরার সামনে কী শ্রমিক, কী ম্যানেজার, কেউই মুখ খুলতে চাইল না বা ছবিও তুলতে দিল না।

নয়াসাইলি বাগানটি বন্ধ হয়ে গেলে বেশ কয়েকবার প্রশাসনিক স্তরে বৈঠক হলেও বাগান খোলেনি মালিকপক্ষ। বাগান বন্ধ হয়ে থাকায় প্রায় অর্ধাহার এবং অনাহারে দিন কাটাতে কাটাতে শ্রমিকরা নানা সমস্যায় জর্জরিত হয়ে অবশেষে চা গাছের পরিচর্যা শুরু করে, এবং নতুন পাতা গজালে তা বিক্রি করেই জীবিকার্জন করবে বলে সিদ্ধান্ত নেয়। ফলে এই ঘটনায় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয় মালিকপক্ষ। বাগানের শ্রমিক দীনেশ বারোয়া, গীতা লোহাররা জানান, তাঁরা বিনা শর্তে বাগান খোলার জন্য মালিকপক্ষের কাছে আরজি জানালেও মালিকপক্ষ বাগান খোলার সদিচ্ছা না দেখানোয় পেটে খিদে নিয়ে আর ক’দিন বাঁচা যায়, তাই বাধ্য হয়ে মালিকের প্রতি আস্থা হারিয়ে নাগরাকাটা ব্লকের নয়াসাইলি চা-বাগানে কাজ শুরু করে শ্রমিকরা নিজ উদ্যোগেই। আবার নয়াসাইলি চা-বাগানের ম্যানেজার ভরত শর্মার অভিযোগ, ম্যানেজমেন্ট বাগান খুলতে

চাইলেও শ্রমিকদের অসহযোগিতার জন্য বাগান খোলা যায়নি। এই চাপানউতোরের মধ্যেই টানা ৮১ দিন বন্ধ থাকবার পর বাগান খুললেও বাগানের সার্বিক পরিস্থিতি ভাল নয়। নাগরাকাটা ব্লকের এই নয়াসাইলি বাগানের ছবি তুলতে গিয়েই ছোটখাটো বাধার সম্মুখীন হতে হল আমাকে এই ক্যামেরা নামক যন্ত্রমানবটার জন্যই।

আসলে আমার ক্ষেত্রসমীক্ষার ধরনটা একটু ভিন্ন রকমের। বেড়াতে যাওয়ার ছলে সাধারণ টুরিস্টের মতো করে বাগানে ঢুকি এবং দু'-চারজনের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে গল্প করতে করতে আমি প্রয়োজনীয় তথ্য নিতে থাকি, এবং সবশেষে তাদেরকে সঙ্গে নিয়েই সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ কিছু ছবি তুলি। কিন্তু সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে, চা-বাগিচা নিয়ে সাংবাদিক বা লেখক বা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার প্রতিনিধিরা কাজ করতে ঢুকলে প্রয়োজনীয় তথ্য পাচ্ছেন না অথবা অনেকেই সহযোগিতা করছেন না। মালিক-শ্রমিক, সংগঠক, চা-বাগিচা নেতৃত্ব বা ম্যানেজমেন্ট— সর্বস্তরেই কেমন যেন সন্দেহের বাতাবরণ। কেউ তথ্য দিতে চাইছেন না, কেউ আবার চাইছেন না ছবি তুলি। আর কোনও পত্রিকা বা কাগজ থেকে এসেছি শুনলেই কোনও কোনও ম্যানেজার লোক লাগিয়ে দিচ্ছে পিছনে। এবং মজার ব্যাপার লক্ষ করলাম, যে সকল বাগান সমস্যাজর্জরিত, অধিকাংশ বাগানেরই পরিচালন কর্তৃপক্ষের মূল ব্যবসা কিন্তু চা-বাগিচা নয়। তাই বাগিচার প্রতি তাদের দরদ কম এবং উত্তরবঙ্গের চা-বলয়ের মৃত্তিকাকে এদের অনেকেই মৃত্তিকা বলে ভাবে না। কারণ এরা টি প্ল্যান্টারস নয়, চা 'বেওসায়ি'।

চা শ্রমিকদের যৌথ সংগঠন জয়েন্ট ফোরামের অন্যতম শরিক প্রোগ্রেসিভ টি ওয়ার্কারস ইউনিয়ন-এর সহসভাপতি রাজেশ বারলা, আলিপুরদুয়ার-কোচবিহার চা-বাগান মজদুর ইউনিয়নের সম্পাদক বিকাশ মাহালির মতে, যেহেতু বাগানের শ্রমিকদের দোষে সাসপেনশন অব ওয়ার্ক হয় না তাই বাগান বন্ধ থাকাকালীন শ্রমিকদের প্রাপ্য মজুরি দেওয়া উচিত। শ্রমিকপক্ষ এই ন্যায্য পাওনার দাবিতে ট্রাইবুনালেরও দ্বারস্থ হতে চায়। এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে, রাজ্য সরকার শ্রমিক-স্বার্থের কথা বিবেচনা করে বাগান কর্তৃপক্ষকে নানাভাবে সাহায্য করলেও, নানান বাগান কর্তৃপক্ষ সাসপেনশন, লক আউট বা ক্লোজার ঘোষণা করছে। বিশেষত বছরের যে সময়টাতে কাটিং বা প্রুনিং হয় বা বাগান পরিচর্যার কাজ চলে, সেই সময়েই নানান ছলছুতোয় বাগান বন্ধ করে দিতে চায়

> মজার ব্যাপার লক্ষ করলাম, যে সকল বাগান সমস্যাজর্জরিত, অধিকাংশ বাগানেরই পরিচালন কর্তৃপক্ষের মূল ব্যবসা কিন্তু চা-বাগিচা নয়। তাই বাগিচার প্রতি তাদের দরদ কম এবং উত্তরবঙ্গের চা-বলয়ের মৃত্তিকাকে এদের অনেকেই মৃত্তিকা বলে ভাবে না। কারণ এরা টি প্ল্যান্টারস নয়, চা 'বেওসায়ি'।

মালিকপক্ষ। এটা নিত্য ঘটনা এবং শ্রমিকরাও এই ব্যাপারটাতে সম্ভবত অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে। সাসপেনশন অব ওয়ার্ক ঘোষণা করে বাগান কর্তৃপক্ষর বাগান ছাড়ার ঘটনা ইতিপূর্বে ঘটেছে কখনও বোনাসের দাবিতে, কখনও শ্রমিক বিক্ষোভের জেরে; কখনও নিরাপত্তার কারণ দেখিয়ে বাগান ছাড়ার ঘটনা চাক্ষুষ করেছে ডুয়ার্স। কিন্তু সম্পূর্ণ সরকারি খরচে বাগান চলবে, আর লাভের ধন পুরোটাই মালিকের পকেটে যাবে— এভাবে চলতে পারে না বলে মনে করে চা-শিল্প সংশ্লিষ্ট মহল।

ন্যাশনাল ইউনিয়ন অব প্ল্যান্টেশন ওয়ার্কারস-এর শ্রমিক নেতা প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে পেলাম শ্রমিক শোষণের এক ভয়ংকর চিত্র। ২০০২ সালের আগে পর্যন্ত বক্সা ডুয়ার্স টি কোম্পানির অন্তর্ভুক্ত কালচিনি ও রায়মাটাং চা-বাগানে বড় কোনও সমস্যা ছিল না। কিন্তু ২০০২ সালের পর থেকে শ্রমিকদের মজুরি ধীরে ধীরে অনিয়মিত হতে শুরু করে। টানা আট বছর পর ২০১০ সালে তৎকালীন জলপাইগুড়ির জেলাশাসকের মাধ্যমে কলকাতা হাই কোর্টের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে সম্পূর্ণ সরকারি খরচে, চা-বাগানের মালিক নিজের ঘর থেকে এক পয়সাও বিনিয়োগ না করে ১০০ দিনের কাজের টাকায় বাগানের খরচ দিনের পর দিন চালিয়ে যেতে থাকে। কালচিনি ব্লকে এমন বেশ কয়েকটি চা-বাগান আছে, যেগুলির উৎপাদন কালচিনি এবং রায়মাটাং বাগানের থেকে কম। তারা কিন্তু সরকারকে ব্ল্যাকমেলের রাস্তায় হাঁটছে না। বাগান কর্তৃপক্ষর উপর রুষ্ট হলেও মালিকপক্ষের সংগঠন ডিবিআইটিএ বাগান কর্তৃপক্ষর বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেনি। এই প্রসঙ্গে ডিবিআইটিএ সচিব

বেড়াতে চলুন আন্দামান

গ্রুপ টুর
যাত্রা শুরু
২১ মে ২০১৭
(পোর্ট ব্লেয়ার থেকে পোর্ট ব্লেয়ার)
আসন সীমিত

৭ রাত ৮ দিনের প্যাকেজ টুর

পোর্ট ব্লেয়ার	-	৪ রাত
হ্যাভলক	-	২ রাত
নীল	-	১ রাত

প্যাকেজ রেট
১৭,৮৫০ টাকা (জন প্রতি)
১৬,৯০০ টাকা (তৃতীয় ব্যক্তি)
১৪,৩০০ টাকা (৫-১১ বছর)
৮,৯০০ টাকা (২-৪ বছর)
(দ্রষ্টব্য: বিমান ভাড়া ব্যতীত প্যাকেজ রেট)

প্যাকেজ খরচের অন্তর্গত
সাইট সিইং, পরিবার প্রতি ঘর, নন-এসি গাড়ি, খাওয়া (ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ ও ডিনার), সরকারি বোট, সকল পারমিট

বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন
HOLiDAYAAR
Siliguri Office: Haren Mukherjee Road, Hakimpara, Siliguri 734001 Ph: 0353-2527028, +91 9002772928
Cooch-Behar Office: Ph: +91 9434042969
Jalpaiguri Office: Addaghar, Mukta Bhaban, Merchant Road Jalpaiguri 735101 Ph: 03561-222117, 9434442866

শ্রমিকদের মজুরি দিতে বাগিচাগুলিতে মোট কী পরিমাণ নগদ টাকার প্রয়োজন তা চা মালিকদের সংগঠনগুলি রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে জানাবে। সেই মোতাবেক রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বাগানগুলির লিড ঋণ প্রদানকারী ব্যাঙ্কগুলিকে নগদের জোগান দেবে।

সুমন্ত্র গুহঠাকুরতা জানান, বাগান কর্তৃপক্ষর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়ার বিষয়টি নির্ভর করে চেয়ারম্যানের সিদ্ধান্তের উপরে। তবে মালিকদের সংগঠন যে বাগান কর্তৃপক্ষগুলির কাজে সন্তুষ্ট নয়, তার আভাস কিন্তু পাওয়া গিয়েছে সুমন্ত্রবাবুর সঙ্গে আলাপচারিতায়। শ্রমিক নেতা প্রভাত মুখোপাধ্যায় জানান, ২০১০ সালে বর্তমান মালিকের হাতে বাগান তুলে দেওয়ার পর থেকে বাগানের পানীয় জল, বিদ্যুৎ সরবরাহ, স্বাস্থ্য, রাস্তাঘাট নির্মাণ ইত্যাদি বিষয়ে রাজ্য সরকার যথেষ্ট সহযোগিতা করেছে বাগানগুলিকে। বক্তব্যের সমর্থন মেলে আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদের সভাধিপতি এবং চা-বাগিচা তৃণমূল কংগ্রেস মজদুর ইউনিয়নের সভাপতি মোহন শর্মার বক্তব্যে। শ্রম দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, বাগানের দায়িত্ব নেবার পর প্রতি মাসেই শ্রমিকদের গ্র্যাচুইটির যত টাকা জমা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বাগিচা কর্তৃপক্ষ, তার এক ভাগও টাকা জমা পড়েনি সরকারি দপ্তরে। এটা ঘটনা যে, দুই বাগান মিলিয়ে প্রায় পঞ্চাশোর্ধ্ব শ্রমিক গ্র্যাচুইটির টাকা পাননি এবং পরবর্তীতে তাঁরা মারা যাওয়ার পর তাঁদের পরিবারও সেই টাকা পায়নি। বাগানের শ্রমিক আবাসগুলি শেষ কবে মেরামত করা হয়েছিল তা মনে করতে পারছেন না শ্রমিকদের অনেকেই।

মালিকপক্ষের সংগঠন আইটিপিএ বীরপাড়ার অফিসে অনুষ্ঠিত এক দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে নয়াসাইলি বাগান খোলা হলেও, ১৮.৫ বা ১৬ শতাংশ হারে নয়, শ্রমিকদের বকেয়া বোনাস দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয় ৮.৩৩ শতাংশ হারে। দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া শ্রমিক, বাবু স্টাফ, সাবস্টাফরা ওই হারে অসন্তুষ্ট থাকলেও কোনও সংঘাতে যায়নি। কারণ, সাতের দশকে একদিনের জন্য বাগান বন্ধ হলেও নয়াসাইলির ১২৯ বছরের ইতিহাসে টানা ৮১ দিন বন্ধ থাকল এই বাগান। পুজোর বোনাসকে কেন্দ্র করে ২৪ সেপ্টেম্বর বাগানটিতে তালা ঝোলে। বোনাস কাঁটাতেই এই নকআউট। অবশেষে বাগান খোলে ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি। শ্রমিকদের ব্ল্যাকমেল করার চিত্রটা যে কী ভয়ংকর তা বোঝা যাবে একটা ছোট্ট পরিসংখ্যানে। পুজোর সময় ১৬ শতাংশ বোনাসের ব্যাপারে গৃহীত সিদ্ধান্ত মালিকপক্ষ মেনে নেয়। ১৮০০ শ্রমিক অধ্যুষিত বাগানের মজদুর ইউনিয়ন তা প্রত্যাখ্যান করে, বোনাস নিয়ে বিবাদের জেরে বন্ধ হয় বাগান। প্রথম ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে বোনাসের হার নেমে আসে ১০ শতাংশে। দ্বিতীয় বৈঠকে সেটা নেমে আসে ৮.৩৩ শতাংশ হারে। শ্রমিকরা রাজি হলেও বাগান খোলেনি। সর্বশেষ বৈঠকে মালিকপক্ষ জানায়, ২০১৭-র মার্চ মাসে ৮.৩৩ শতাংশ হারে বোনাস দেবে তারা, এবং ২০১৭ সালেও এই হার থাকবে একই। এইভাবেই শ্রমিক শোষণ চলছে চা-বাগিচায়। শ্রমিকদের অসহায়তার সুযোগে মালিকপক্ষ চালাচ্ছে নির্বিচার শোষণ। চালসায় অনুষ্ঠিত দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে মালিকপক্ষের এই ধরনের অবাস্তব চুক্তিকে মান্যতা না দিয়ে ক্ষুব্ধ শ্রমিকরা বৈঠক বয়কট করে। বাগানের দুই শ্রমিক নেতা অমরজিৎ বড়াইক এবং বিজয় লাকড়া শ্রমিকদের প্রতি মালিকপক্ষের এই ব্ল্যাকমেলিং-এর নীতিকে তুলে ধরে বলেন, মালিকপক্ষের ছলছাতুরীকে কোনও শ্রমিকই ভাল চোখে দেখছে না বলে সরকারি মধ্যস্থতায় ত্রিপাক্ষিক চুক্তির মাধ্যমে বাগানটা যাতে খোলে, তার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। ডান-বাম শ্রমিক নেতাদের মালিকপক্ষের প্রতি আস্থাহীনতাই এখন দস্তুর ডুয়ার্সের চা-বাগিচা বলয়ে। অত্যন্ত আশ্চর্যের কথা, এই অসম্মানজনক চুক্তিতেই অবশেষে খুলল নয়াসাইলি চা-বাগান।

আর-একটি বাগান কুমলাই। ২০১৫ সালের ১৪ নভেম্বর কুমলাই চা-বাগিচার পরিচালন কর্তৃপক্ষ বাগান ছেড়ে চলে যান।

সরকারি বিধি অনুযায়ী, এক বছর বাগান বন্ধ থাকলে কর্মরত শ্রমিক কর্মচারীরা রাজ্য সরকারের কাছ থেকে জনপিছু ১৫০০ টাকা বিশেষ অনুদান বা ফাউলাই পায়। পুজোর সময় উৎসব ভাতা হিসেবে আরও ১৫০০ টাকা দেওয়া হয়। কিন্তু ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট না থাকার জন্য পুজোর সময়ে উৎসব ভাতা বাগানের শ্রমিকরা পায়নি। অথচ শ্রম দপ্তরের কোষাগারে টাকা জমা থাকা সত্ত্বেও ডুয়ার্সের কুমলাই চা-বাগিচার ৯৩৭ জন শ্রমিক ফাউলাই এবং মাসিক অনুদান কোনওটাই পায়নি। ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ জানুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত অ্যাকাউন্ট না খোলায় চা-বাগিচা শ্রমিকদের দুর্ভোগের মধ্যে দিন অতিবাহিত করতে হচ্ছে। জলপাইগুড়ির ডেপুটি লেবার কমিশনার শ্যামল দত্তকে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করলে তিনি জানিয়েছিলেন, ২০১৬ সালের এপ্রিল মাস থেকে জানুয়ারি মাসের চলতি সময় পর্যন্ত বাগানের পিএফ অ্যাকাউন্টধারী ৯৩৭ জন শ্রমিকের ফাউলাইয়ের অর্থ শ্রম দপ্তরে জমা আছে। জমাকৃত অর্থের পরিমাণ ১ কোটি ৪০ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকা। শ্রমিকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলামাত্রই ফাউলাইয়ের টাকা দেওয়া হবে। মালবাজারের সহকারী লেবার কমিশনার আর্থার হোড়ো লিখিতভাবে ইউনাইটেড ব্যাঙ্কের ডামডিম শাখার ম্যানেজারকে ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণের অনুরোধ জানান, মালবাজারের মহকুমাশাসক জ্যোতির্ময় তাঁতি সমস্যার নির্যাস জেলাশাসককে জানান। বাস্তব অবস্থা পর্যালোচনা করে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষর উচিত ছিল, কুমলাই চা-বাগিচার শ্রমিকদের অ্যাকাউন্ট খোলবার কাজে অগ্রাধিকার দেওয়া। কিন্তু এপ্রিল থেকে জানুয়ারি পর্যন্ত এই ১০ মাসে কোনও অগ্রগতি না ঘটায় নিদারুণ আর্থিক সংকটে দিন কাটাতে বাধ্য হয়েছেন শ্রমিকরা।

গয়েরকাটা চা-বাগান অত্যন্ত ভাল বাগান। কোনও শ্রমিক সমস্যা নেই। বাগিচায় শ্রমিকসংখ্যা প্রায় ২৫০০। চা-বাগানের বেশির ভাগ শ্রমিকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নেই। ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষর তরফেও বাগান শ্রমিকদের অ্যাকাউন্ট খোলার ব্যাপারে সেরকম কোনও উদ্যোগ দেখা যায়নি। যেহেতু বর্তমানে অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে চা শ্রমিকদের বেতন দেওয়ার পদ্ধতি চালু করা হয়েছে তাই বেতন দেওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে বাগান কর্তৃপক্ষকে। ফলে বাড়ছে শ্রমিক-মালিক মন কষাকষি। গয়েরকাটা চা-বাগানের ম্যানেজার মানস ভট্টাচার্যর মতে, শ্রমিকদের বেতন দিতে না পারায় তাঁরাও সমস্যায় পড়ছেন। শ্রমিক অসন্তোষ বাড়ছে। প্রোগ্রেসিভ টি ওয়ার্কারস ইউনিয়নের ধূপগুড়ি ব্লক সম্পাদক বিরাজ লাকড়ার মতে, অনলাইন পদ্ধতিতে বাগান শ্রমিকদের বেতন দেওয়ার কাজ শুরু হওয়াতে বিপাকে পড়েছে চা-বাগান কর্তৃপক্ষ থেকে চা শ্রমিকরা সকলেই। পরিকাঠামো তৈরি না করে হঠকারী সিদ্ধান্তের ফলে শ্রমিক-মালিক উভয় পক্ষকে মাশুল গুনতে হচ্ছে বলে তিনি মনে করেন। বিভিন্ন চা-বাগান অ্যাসোসিয়েশনও খুব তাড়াতাড়ি মজুরি প্রদান সংক্রান্ত জট ছাড়াতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। ডিভিশনাল কমিশনারকে চিঠি পাঠিয়েছে চা মালিকদের অন্যতম সংগঠন টি অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্ডিয়া (টাই)। সংগঠনের ডুয়ার্স শাখার সম্পাদক বিশিষ্ট চা-বাগান বিশেষজ্ঞ রাম অবতার শর্মার মতে, শুধুমাত্র শীতকালীন কাজের জন্যই নয়, এই সময়ে বাগানে প্রচুর নগদ টাকার প্রয়োজন হয়।

নতুন সিদ্ধান্তে গৃহীত ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত পুরনো প্রথাতে মজুরি দেওয়ার বাধা দূর হলেও আদৌ এখনও কোনও স্থিতাবস্থাই আসেনি চা-বাগিচাগুলিতে। শীতের কাজের টাকা তো দূরের কথা, নগদের অভাবে বাবু স্টাফদের রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডারের দাম, শ্রমিক আবাস মেরামতের জন্য বাঁশ-কাঠের দাম মেটাতেও নাভিশ্বাস উঠে গিয়েছে। এরকম হাজারো খরচ নগদেই দিতে হয়।

চা-বাগানে ইতিমধ্যেই রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অনুমোদনক্রমে চা-মহলসহ প্রশাসন এবং ব্যাঙ্কগুলির শীর্ষকর্তাদের চিঠি দিয়ে রাজ্যের অর্থ দপ্তরের প্রধান সচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী জানিয়ে দিয়েছেন, চা-বাগিচায় নগদে মজুরির সময়সীমা ২০১৭ সালের ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। গত ১৬ ডিসেম্বর ২০১৬-তে নোট বদলের পর নিয়মকানুনের প্রভাবে চা মজুরি প্রদানের সংকট নিয়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আঞ্চলিক নির্দেশককে রেখা ওয়ারিওর সঙ্গে নবান্নতে মুখ্যসচিব বাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি ভিডিয়ো কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয় বিভিন্ন ব্যাঙ্কের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে। বলা হয়েছিল, যে সমস্ত এলাকার ব্যাঙ্কগুলি চা-বাগানগুলিকে শ্রমিকদের মজুরি নগদে প্রদান করেছে, তারা সেভাবেই মজুরি খাতের টাকা দিয়ে যাবে। অন্য দিকে, যেসব এলাকায় ব্যাঙ্কগুলি চা-বাগানকে মজুরির টাকা দিতে পারছে না, সেখানে অর্থ দপ্তরের ১৬ নভেম্বরের নির্দেশিকা অনুযায়ী জেলাশাসকের অ্যাকাউন্ট মারফত বাগানগুলি মজুরির টাকা তুলতে পারবে। দু'টি পদ্ধতিই চলবে আগামী ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত। আগামী ৩১ মার্চের মধ্যে চা-বাগিচাগুলির সংশ্লিষ্ট পরিচালকরা তাঁদের সমস্ত শ্রমিকের ব্যক্তিগত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলে দিতে উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ করবে বলে রাজ্যের অর্থ সচিবের চিঠিতে উল্লেখ আছে। ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের কেওয়াইসি-র জন্য শ্রমিকদের দেওয়া বাগান কর্তৃপক্ষর শংসাপত্রই যথেষ্ট বলে জানানো হয়। এ ছাড়াও সমস্ত ব্যাঙ্ক ২০১৭ সালের ৩১ মার্চের মধ্যে সব বাগানে এটিএম, মাইক্রো এটিএম, ব্যাঙ্কের শাখা বা বাণিজ্যিক প্রতিনিধি নিয়োগের ব্যবস্থা করে দেবে। শ্রমিকদের মজুরি দিতে বাগিচাগুলিতে মোট কী পরিমাণ নগদ টাকার প্রয়োজন তা চা মালিকদের সংগঠনগুলি রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে জানাবে। সেই মোতাবেক রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বাগানগুলির লিড ঋণ প্রদানকারী ব্যাঙ্কগুলিকে নগদের জোগান দেবে। প্রকৃত চাহিদা অনুযায়ী মজুরি খাতের নগদের সরবরাহ করার প্রয়োজনীয়তার কথাও চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে। চা-মজুরির বিষয়ে অতিরিক্ত মুখ্যসচিব প্রতি ১০ দিন পরপর বাগানগুলির প্রতিনিধিদের সঙ্গে রিভিউ বৈঠক করবেন বলে অর্থ সচিব জানান। নতুন সিদ্ধান্তে গৃহীত ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত পুরনো প্রথাতে মজুরি দেওয়ার বাধা দূর হলেও আদৌ এখনও কোনও স্থিতাবস্থাই আসেনি চা-বাগিচাগুলিতে। শীতের কাজের টাকা তো দূরের কথা, নগদের অভাবে বাবু স্টাফদের রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডারের দাম, শ্রমিক আবাস মেরামতের জন্য বাঁশ-কাঠের দাম মেটাতেও নাভিশ্বাস উঠে গিয়েছে। এরকম হাজারো খরচ নগদেই দিতে হয়।

ব্যতিক্রমী চিত্র দেখা গেল ডেঙ্গুয়াঝাড় বাগানে। মজুরির টাকা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা পড়লেও সেই টাকা তুলতে গিয়ে নানান সমস্যায় পড়তে হচ্ছিল শ্রমিকদের। তাই শ্রমিকদের মজুরির সমস্যা মেটাতে চা-বাগানেই পৌঁছে গেলেন ব্যাঙ্ককর্মীরা। জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে ব্যাঙ্কের গ্রাহক সেবাকেন্দ্রের সহযোগিতায় ব্যাঙ্ককর্মীরা ডেঙ্গুয়াঝাড় বাগান নিয়ে আধার কার্ডের মাধ্যমে নগদে মজুরি দেন

শ্রমিকদের। উল্লেখ্য, জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার জেলার মোট ১৫০টি বাগানের মধ্যে অধিকাংশ বাগানের শ্রমিকদের অ্যাকাউন্টের কাজ চলছে। কিন্তু ব্যাঙ্কে গিয়ে বা এটিএম থেকে টাকা তুলতে ঝামেলা পোহাতে হচ্ছে শ্রমিকদের। বাগানের কাজকর্ম শেষ করে শ্রমিকরা ব্যাঙ্কে গিয়ে যখন পৌঁছাচ্ছেন, তখন আর্থিক লেনদেন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। শতাধিক শ্রমিক একসঙ্গে টাকা তুলতে গেলে ভিড়ের চাপে ব্যাঙ্কের স্বাভাবিক কাজকর্ম ব্যাহত হচ্ছে। টাকা তোলার স্লিপ পূরণ করতেও শ্রমিকরা নিরক্ষর বলে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে ব্যাঙ্ককে। এই সমস্যা মেটাতেই বাগানে এসে মজুরি দেওয়ার জন্য ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানানো হয়। সেইমতো ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ বাগানে এসে বেশ কিছু শ্রমিককে নগদে মজুরি দেন। স্টেট ব্যাঙ্কের

মজুরির জন্য চা শ্রমিকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট করার যে নির্দেশ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দিয়েছে, তাতে কোনও আপত্তি না থাকলেও শ্রমিকদের টাকা তোলার ক্ষেত্রে বহুবিধ সমস্যা নিয়ে প্রশ্ন তুলল চা শ্রমিক সংগঠন এবং বাগান মালিক সংগঠনগুলি। কাজের দিনে কামাই করে মজুরি হারানোর খাঁড়া মাথায় ঝুলিয়ে রেখে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলতে যাওয়া, এটিএম ব্যবহারের নিয়মকানুন সম্পর্কে পরিচিত হওয়ার সমস্যা ও প্রসঙ্গের কথা তোলা হয়েছে।

ডেঙ্গুয়াঝাড় শাখার ম্যানেজার দেবাশিস দাস জানান, একসঙ্গে প্রচুর শ্রমিক ব্যাঙ্কে এসে ভিড় জমাবার ফলে স্বাভাবিক কাজকর্মে চাপ পড়ছে বলে বাগানে গিয়ে বায়োমেট্রিক যন্ত্রে শ্রমিকদের আঙুলের ছাপ নিয়ে মজুরি প্রদানের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার উত্তরবঙ্গের চিফ রিজিয়নাল ম্যানেজার সুশান্তকুমার পাল জানান, আগামী মার্চ মাসের মধ্যেই একত্রিশটি বাগানে এটিএম পরিষেবা চালু করবে ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, যার মধ্যে দু'টি বাগানে এটিএমের

পরিকাঠামো তৈরির কাজও শুরু হবে। নভেম্বর মাসে নোট বাতিলের পর থেকেই চা শ্রমিকদের মজুরি নিয়ে সংকট শুরু হয়। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নির্দেশে অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তোলবার সর্বোচ্চ সীমা স্থির হতেই সমস্যায় পড়ে ব্যাঙ্কগুলি। শেষ পর্যন্ত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বাগান শ্রমিকদের দ্বিপাক্ষিক মজুরি ব্যাঙ্ক থেকে তোলবার ব্যাপারে কর্তৃপক্ষকে অনুমতি দেয়। তারপর থেকে শ্রমিকদের নিজস্ব ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টেই সরাসরি মজুরি প্রদান করা হবে বলে জানিয়ে দেওয়া হলেও নতুন ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করে। চা-শিল্পের সঙ্গে যুক্ত অনেকেই বলতে থাকেন, তবে কি মজুরির টাকা তুলতে ছুটি নিয়ে ব্যাঙ্কে যেতে হবে শ্রমিকদের? তা ছাড়া এটিএমে টাকা তুলতে গিয়ে জটিল প্রযুক্তিগত সমস্যা, পিন কোডের ব্যবহার নিয়েও সন্দেহ রয়েছে। এমনকি একটি এটিএমে যে পরিমাণ টাকা থাকে তা শুধু শ্রমিকরাই নয়, স্থানীয় মানুষও ব্যবহার করবেন। তাই শ্রমিকরা এটিএম থেকে তাঁদের প্রয়োজনীয় অর্থ পাবেন কি না তা নিয়েও সংশয় আছে।

মজুরির জন্য চা শ্রমিকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট করার যে নির্দেশ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দিয়েছে, তাতে কোনও আপত্তি না থাকলেও শ্রমিকদের টাকা তোলার ক্ষেত্রে বহুবিধ সমস্যা নিয়ে প্রশ্ন তুলল চা শ্রমিক সংগঠন এবং বাগান মালিক সংগঠনগুলি। কাজের দিনে কামাই করে মজুরি হারানোর খাঁড়া মাথায় ঝুলিয়ে রেখে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলতে যাওয়া, এটিএম ব্যবহারের নিয়মকানুন সম্পর্কে পরিচিত হওয়ার সমস্যা ও প্রসঙ্গের কথা তোলা হয়েছে। জেলাশাসকের মাধ্যমে শীর্ষ ব্যাঙ্কের কাছে চা-বাগানে ব্যাঙ্ক পরিষেবার সমস্যা, চা শ্রমিকদের সমস্যা ইত্যাদি বিষয়ে তাদের লিখিত মতামত পাঠানো হবে বলে জানা গিয়েছে। চা শ্রমিকদের মজুরি সমস্যার স্থায়ী সমাধান হিসেবে উত্তরের তিনশোটিরও বেশি চা-বাগানের শ্রমিকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলার নির্দেশ দিয়েছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। এই অ্যাকাউন্টেই শ্রমিকদের মজুরি বা বেতন জমা পড়বে।

জলপাইগুড়ি জেলার ৯০টি এবং আলিপুরদুয়ার জেলার ৬০টি বড় চা-বাগানে সমস্ত স্থায়ী শ্রমিকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নির্দেশ অনুযায়ী শ্রমিকদের ফোটো, সচিত্র ভোটার পরিচয়পত্র, আধার কার্ড, ড্রাইভিং লাইসেন্সের কপি ইত্যাদি নথি বাগানগুলির মাধ্যমে জমা করার কথা বলা হলেও, সিটু-র জেলা সম্পাদক জিয়াউল আলম মনে করেন, ইংরেজ আমল থেকেই নগদে মজুরি দেওয়া হয়, এবং বাগানগুলি নিজেদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তুলে শ্রমিকদের নগদেই বণ্টন করত। ব্যাঙ্ক পরিষেবা সম্পর্কে অধিকাংশ বাগিচা শ্রমিকই অজ্ঞ। সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত যেহেতু বাগানে কাজ করে শ্রমিকরা, তাই শ্রমিকদের ছুটির দিন বাদে অন্য দিন ব্যাঙ্কে গিয়ে অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তোলা সমস্যাজনক হবে। ব্যাঙ্কে গেলেও টাকা তোলার স্লিপ পূরণ করে লাইনে দাঁড়িয়ে টাকা তুলে দূরবর্তী বাগানে ফেরাও অসুবিধাজনক। বহু শ্রমিক এখনও স্বাক্ষর করতে পারে না। যারা স্বাক্ষর করতে পারে, তাদের অধিকাংশই ইংরেজি এবং বাংলায় লেখা ফর্ম পূরণ করতে পারবে না। এই অবস্থায় বাগানগুলি তাদের উৎপাদনের ক্ষতি করে শ্রমিকদের দিনের পর দিন ব্যাঙ্কে টাকা তোলার জন্য ছুটিও দেবে না।

ইন্ডিয়ান টি প্ল্যান্টেশন অ্যাসোসিয়েশন-এর মুখ্য উপদেষ্টা অমিতাংশু চক্রবর্তীর মতে, জলপাইগুড়ি জেলায় ৯০টি বাগিচার প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ স্থায়ী চা শ্রমিকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলা হবে। কিন্তু চা-বাগানে শ্রমিকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলার নির্দেশিকা সম্পূর্ণ রূপেই অবৈজ্ঞানিক। কারণ, চা শ্রমিকদের কীভাবে বাগানগুলি নগদে মজুরি প্রদান করে থাকে বা ব্যাঙ্ক থেকে ফর্ম পূরণ করে কাউন্টার থেকে বা এটিএমে গিয়ে কীভাবে টাকা তুলতে হয়— এই অভিজ্ঞতা চা শ্রমিকদের আছে কি না তা খতিয়ে দেখে এই উদ্যোগ নেওয়া উচিত ছিল রিজার্ভ ব্যাঙ্কের। কারণ, অমিতাংশুবাবুর মতে, চা-বাগিচা অফিস থেকে অনেক সময় নগদে মজুরি প্রদানের সময় স্বাক্ষর-জানা শ্রমিককেও টিপসই নিয়ে টাকা দেওয়া হয় সময় বাঁচাতে। জলপাইগুড়ি জেলা সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের চিফ ম্যানেজার তথা

সমস্যার মাঝেই আলোকবর্তিকা হিসেবে চিহ্নিত হল আলিপুরদুয়ার শহর লাগোয়া মাঝেরডাবরি চা-বাগান। শতবর্ষে পদার্পণ করে নিজেদের ১০০ শতাংশ ক্যাশলেস প্রতিষ্ঠান হিসেবে ঘোষণা করেছে মাঝেরডাবরি চা-বাগান। চা-শিল্পের নিরিখে এই বাগানটিই প্রথম রাজ্যে নগদহীন বাগান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করল। মাঝেরডাবরির সমস্ত স্থায়ী এবং অস্থায়ী শ্রমিকের পাশাপাশি নগদহীন লেনদেনের পরিষেবার আওতায় আনা হয়েছে স্থানীয় দোকানপাট থেকে শুরু করে বাগানের মন্দিরকেও। শ্রমিক-কর্মচারীদের মজুরি এবং বেতন দেওয়া হবে বায়োমেট্রিক যন্ত্রের মাধ্যমে। এর জন্য প্রত্যেকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলে তা নিজেদের আধার কার্ডের সঙ্গে সংযুক্তিকরণের কাজও মাঝেরডাবরিতে শেষ।

লিড ডিস্ট্রিক্ট ম্যানেজার অনাদি বিশ্বাস জানান, উন্নতমানের এটিএমে ২০টি করে কেস বা বাক্স থাকে, যেখানে টাকা ভরা হয়। ১০০ টাকার নোট ২০ প্যাকেট করে ভরে যেখানে মোট ২ লক্ষ ভরা যায়, সেখানে ২,০০০, ১,০০০, ৫০০, ১০০-র নোটে ১০-২০ লাখ ভরা যায়। এর তীব্র বিরোধিতা করেছেন ন্যাশনাল ইউনিয়ন অব প্ল্যান্টেশন ওয়ার্কারস-এর রাজ্য যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মণিকুমার দার্ণাল। তাঁর মতে, চা শ্রমিকরা খুব বেশি হলে ১,০০০, ৫০০ এবং ১০০-র নোটে মজুরি নিতে পারে। এটিএমে বড় নোট ভরা হলে শ্রমিকরা সমস্যায় পড়বে, আবার ১০০ টাকার বেশির ভাগ নোট ভরলে অধিকাংশ চা শ্রমিকই বেতনের টাকা তুলতে পারবে না।

উল্লেখ করা যায়, দৈনিক মজুরিতে বাগিচাক্ষেত্রগুলিতে যারা কাজ করে, তারা স্থায়ী শ্রমিক। এর বাইরেও অস্থায়ী বা বিঘা কিংবা ক্যাজুয়াল কর্মীর সংখ্যা শ্রম দপ্তরের রিপোর্ট অনুযায়ী প্রায় ৬৭৪৪০। এই তিন জেলায় স্টাফ, সাব-স্টাফ এবং ফ্যাক্টরি ওয়ার্কার স্টাফ মিলে তিন জেলায় আছে ১৭১৬১ জন। অস্থায়ী বা ক্যাজুয়াল কর্মীরাও পাক্ষিক, মাসিক বা সাপ্তাহিক বেতন পান বলে তাঁদেরকেও অ্যাকাউন্ট করতে হবে। এই পরিস্থিতিতে চা শ্রমিকদের অ্যাকাউন্ট করবার সরকারি প্রচেষ্টা শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে ঠেকবে তা নিয়ে যথেষ্ট সংশয়ের অবকাশ থেকেই যায়।

হাই কোর্টের বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি ক্রেতাসুরক্ষা বিষয়ক লোক আদালতে মতামত দিতে গিয়ে জানান, লোক আদালতগুলির মাধ্যমে চা শ্রমিকদের জন্য শর্ট টার্ম ক্রেডিট বা ডেবিট ব্যবস্থা প্রদান করা উচিত, যাতে কিছুটা হলেও নোট সমস্যার সমাধান হয়।

সমস্যার মাঝেই আলোকবর্তিকা হিসেবে চিহ্নিত হল আলিপুরদুয়ার শহর লাগোয়া মাঝেরডাবরি চা-বাগান। শতবর্ষে পদার্পণ করে নিজেদের ১০০ শতাংশ ক্যাশলেস প্রতিষ্ঠান হিসেবে ঘোষণা করেছে মাঝেরডাবরি চা-বাগান। চা-শিল্পের নিরিখে এই বাগানটিই প্রথম রাজ্যে নগদহীন বাগান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করল। মাঝেরডাবরির সমস্ত স্থায়ী এবং অস্থায়ী শ্রমিকের পাশাপাশি নগদহীন লেনদেনের পরিষেবার আওতায় আনা হয়েছে স্থানীয় দোকানপাট থেকে শুরু করে বাগানের মন্দিরকেও। শ্রমিক-কর্মচারীদের মজুরি এবং বেতন দেওয়া হবে বায়োমেট্রিক যন্ত্রের মাধ্যমে। এর জন্য প্রত্যেকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলে তা নিজেদের আধার কার্ডের সঙ্গে সংযুক্তিকরণের কাজও মাঝেরডাবরিতে শেষ। বায়োমেট্রিক যন্ত্রে শুধুমাত্র আঙুলের ছাপ দিয়েই শ্রমিকরা মজুরি বাবদ অ্যাকাউন্টে জমা পড়া টাকা তুলে নিতে পারবে। বাগানের অফিসেই আপাতত অস্থায়ী ভিত্তিতে একটি মজুরি প্রদানের কাউন্টারও খুলে দেওয়া হয়েছে। সেখানে সপ্তাহে ছ'দিন ব্যাঙ্কের একজন প্রতিনিধি ইতিমধ্যে বসতেও শুরু করে দিয়েছেন। শ্রমিকরা বাগানের ভিতরে অবস্থিত যেসব দোকান থেকে সারা মাস ধরে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনে, সেই দোকানগুলি এখন থেকে এর জন্য নগদে কোনও টাকাপয়সা নেবে না। প্রতি সপ্তাহ, পক্ষ বা মাসের শেষে শ্রমিকপিছু কেনাকাটার বিল দোকানদাররা বাগান কর্তৃপক্ষর কাছে জমা দেবে। বাগানই শ্রমিকদের ব্যক্তিগত মজুরি অ্যাকাউন্টে জমা করে দেবে। দোকান মালিকও বায়োমেট্রিক যন্ত্রের মাধ্যমে তার পাওনা নগদে তুলে দিতে পারবে। বাগানের ঠিকাদার, মালপত্র সরবরাহকারীদের পাওনাও মেটানো হবে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমেই। সত্যি কথা বলতে কী, এ রাজ্যের চা-শিল্পের ইতিহাসে মাঝেরডাবরি যেভাবে পুরোপুরি ক্যাশলেস এবং ডিজিটাইজড হল তা এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

Hotel Yubraj & Restaurant Monarch
(Air Conditioned)

Room	Single	Double
Super Deluxe (Non AC)	Rs 650	900
Deluxe AC	Rs 990	1200
Super Deluxe AC	Rs 1100	1300
VIP Deluxe AC	Rs 2000	2000
Suite	Rs 3000	3000
VIP Suite	Rs 3500	3500
Extra Occupancy on (Non AC)	Rs 100	---
Extra Occupancy on (AC)	Rs 200	---

N.B. Tax as per applicable

Charu Arcade, B. S. Road, Cooch Behar, (W.B.)
Tel: (03582) 227885 / 231710
email: hotelyubrajcoochbehar@gmail.com
www.hotelyubraj.com

ডুয়ার্স থেকে দিল্লি

দেবপ্রসাদ রায়

দিল্লির যুব কংগ্রেসের সাত বছর লেখকের জীবনের সবচেয়ে ঘটনাবহুল সময়। এবং সাফল্যেরও সময় বললে ভুল হবে না। এই উত্থানের পেছনে রাজীবজির অকৃত্রিম সমর্থন ও প্রশ্রয় যেমন কাজ করেছে, তেমনই সহকর্মীদের ভেতরেও কেউ কেউ, বিশেষ করে প্রথম বছরগুলোতে পাশে দাঁড়িয়ে সাহস ও সাহায্য জুগিয়েছে। তাঁদের মধ্যে বিশেষ করে পানিক্কর ও গুলাম নবির অবদান ভুলবার নয়। দিল্লিতে চলাফেরা, থাকা-খাওয়ার সংকটে পানিক্কর যেমন সহযোগিতা করেছেন, তেমনই গুলাম নবির তৎপড়তায় তিনি পৌঁছতে পেরেছেন খোদ নেত্রী তথা ইন্দিরাজির কাছাকাছি। সঞ্জয় গান্ধির তৈরি সংগঠনকে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব পেলেন তাঁর কাছ থেকেই।

।।২৭।।

ধীরে ধীরে রাজীবজির যোগদানের ছবিটা দলের ভিতরে স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। ২এ, মতিলাল নেহরু রোডে আলাদা অফিস করে তিনি বিভিন্ন স্তরের কংগ্রেসের লোকদের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করলেন। তাঁকে সহযোগিতা করবার জন্য কাশ্মীর থেকে ডি পি দারের ছেলে বিজয় দার এবং ছোটবেলার বন্ধু মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির বড় পদে চাকুরিরত অরুণ সিং ওই অফিস থেকে জনসংযোগের কাজ শুরু করলেন।

তবে আত্মপ্রকাশ ঘটল একটা জাতীয় স্তরের কর্মসূচির ভিতর দিয়ে। রাজীবজির উদ্যোগে বিশেষত উত্তর ভারতের রাজ্যগুলো থেকে কৃষকদের সমবেত করে দিল্লির বোট ক্লাবে এক বিশাল কিষান র‍্যালি করা হল। প্রধান বক্তা ইন্দিরাজি। আমার ধারণা, প্রায় ২০ লক্ষ মানুষ এই সমাবেশে যোগ দিয়েছিল। অবশেষে, '৮১ সালের জুন মাসে অমেথি থেকে উপনির্বাচনে জয়ী হয়ে রাজীবজি আনুষ্ঠানিকভাবে দলে যোগ দিলেন।

বয়স তাঁকে আকর্ষিত করেছিল যুব কংগ্রেসের মঞ্চটিকে। তাই মূলত যুব কংগ্রেসের পদাধিকারীদের সঙ্গেই তিনি স্বচ্ছন্দ বোধ করতেন। আজ যে অনেকে বলে, আমি রাজীবজির কাছের মানুষ ছিলাম, সেটাও এই কারণেই। সে সময় বাংলা থেকে ওই পদে অন্য কেউ থাকলে হয়ত এই সুযোগ সে পেত।

উনি প্রত্যেককেই জনে জনে জিজ্ঞাসা করতেন, দলকে আরও গতিশীল করে তুলতে আর কী করা যেতে পারে। আজ অকপটে স্বীকার করি, রাতে পুরুলিয়া থেকে ট্রেনে ফেরবার পথে সিপিআই নেতা বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর কথাগুলো আমার মনে গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল। আমিও এ কথার পিছনে যুক্তি খুঁজে পেতাম যে, ২০ দফা যাতে রূপায়িত না হয়, তার জন্যই ৫ দফা এসেছিল। কারণ ২০ দফা বাস্তবায়িত হলে কায়েমি স্বার্থের মৌচাকে ঢিল পড়ত। যদিও ৫ দফার কর্মসূচির প্রতিটি কর্মসূচি তার নিজস্ব কারণে যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক ছিল, কিন্তু তার রূপায়ণে প্রকৃতপক্ষে কোনও উদ্যোগ ছিল না। তাই রাজীবজি যখন আমার মতামত জানতে চাইলেন, আমি তাঁকে বললাম, আমার দলের ৮০ শতাংশ কর্মী ২০ দফা পুরো বলতে পারবে না। আর ২০ শতাংশ বলতে পারলেও তার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারবে না। কিন্তু মানুষকে জোড়বার জন্য এর চেয়ে ভাল হাতিয়ার আর কিছু হতে পারে না। উনি আগ্রহ নিয়ে বললেন, ঠিক আছে, তুমি একটা পরিকল্পনা দাও, আমি নিশ্চয়ই বিবেচনা করব। পরিকল্পনা রূপায়ণ ও তার বাস্তবায়ন হতে বছর দুয়েক সময় লেগেছিল। তার মাঝখানে বেশ কিছু ঘটনা ঘটে গিয়েছে।

মানেকা গান্ধি প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন ছেড়ে চলে গিয়েছে। এবং 'সঞ্জয় রাষ্ট্রীয় বিচার মঞ্চ' সরকারিভাবে ঘোষণা করা হয়ে গিয়েছে। সে সময় সবচেয়ে বেশি টানাপোড়েনে থাকতে দেখেছি জগদীশ টাইটলারকে। একদিকে ওর অনুগামীরা মানেকার সঙ্গে চলে

যাচ্ছে, অন্য দিকে কংগ্রেস নেতৃত্ব ওকে গোপনে মানেকা গান্ধির কাজ করছে বলে সন্দেহের চোখে দেখছে। ওর অসহায় অবস্থায় একদিন যখন ফোতেদারজি ওকে ডেকে বলল, তিন দিনের ভিতর বিক্ষুব্ধদের অনশন তুলতে না পারলে তোমার উপর শাস্তির খাঁড়া নামবে, ও একদম ভেঙে পড়ল। আমি বললাম, তুমি একজন নির্বাচিত সাংসদ। এত ভয় পাচ্ছ কেন? তোমার পাঁচ বছরের এমপি-শিপ তো কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। ও বলল, তা ঠিক, কিন্তু কেন আমি অবিশ্বাসের পাত্র হব! আমি তো ওদের অনশনে বসাইনি। আমি বললাম, তুমি প্রেসকে বলো যে, তুমি এই উদ্যোগকে দলবিরোধী কাজ বলে মনে করছ, এবং ওদের অবিলম্বে এই পথ পরিত্যাগ করতে বলছ। যদিও ওকে নতুন করে বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠতে অনেক সময় লেগেছিল, সেই সময়ে আমার এই পরামর্শ কাজে লাগিয়ে নিজেকে এই বিক্ষুব্ধ রাজনীতির আঁচ থেকে বাঁচাতে পেরেছিল।

দিল্লির যুব কংগ্রেসের সাত বছর আমার জীবনের সবচেয়ে ঘটনাবহুল সময়। এবং সাফল্যের সময় বললেও ভুল হবে না। এই উত্থানের পিছনে রাজীবজির অকৃত্রিম সমর্থন ও প্রশ্রয় যেমন কাজ করেছে, তেমনই সহকর্মীদের ভিতরেও কেউ কেউ, বিশেষ করে প্রথম বছরগুলোতে পাশে দাঁড়িয়ে সাহস ও সাহায্য জুগিয়েছে। তাদের মধ্যে বিশেষ করে পানিক্কর ও গুলাম নবির অবদান ভোলবার নয়। আগেই বলেছি, দিল্লিতে চলাফেরা, থাকা-খাওয়ার সংকটে পানিক্কর যেমন সহযোগিতা করেছে, তার পরবর্তীতে ওর খেয়াল থাকত, সময় যখন বদলাচ্ছে, সবার সুযোগ-সুবিধা বাড়ছে, তখন মিঠু (ও-ও আমায় মিঠু ডাকত) যেন এর বাইরে না থাকে। ফলে ওর সৌজন্যে পাঁচতারা হোটেল চিনলাম, দূতাবাসগুলো চিনলাম। আবার বিভিন্ন রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ নেতাদের সঙ্গেও আলাপ-পরিচয় ঘটার সুযোগ হতে লাগল।

তবুও একটা নিরাপত্তাহীনতা আমাকে তাড়া করে বেড়াত। প্রণবদার রাজ্যের রাজনীতিতে রুচি নেই, বরকতদা আমাকে স্থান দিতে রাজি নয়, আর দুঃসময়ে যে টিমটা গড়ে উঠেছিল, সেটাও দেখলাম আর অটুট নেই। যে যার নিজের মতো করে বাঁচতে চাইছে।

গুলাম নবি চিঠিপত্র লেখালেখিতে আমার উপর বেশি ভরসা করত। আর আমি সময়ও দিতাম। তাই অনেক সময় একান্তে কথা বলার সুযোগ হত। একদিন তাই বললাম, দেখো, তোমার সবচেয়ে বড় অ্যাডভান্টেজ হল, তোমাকে ইন্দিরাজি

আর দ্বিধা নয়। আমি ওর সঙ্গে ইন্দিরাজির বসার ঘরে পৌঁছে গেলাম। উনি এলেন। একটা সাদা কুর্তা ও মেখলা পরনে। একেবারেই ঘরোয়া পোশাকে। আলোচনা শুরু হল। ২৩ জুন থেকে পক্ষকালব্যাপী কর্মসূচি নেওয়া হবে 'সঞ্জয় পাখোয়ারা'। অন্তর্নিহিত অর্থ ছিল এটা বোঝানো যে, সঞ্জয় গান্ধির স্মৃতিকে হাইজ্যাক করা যাবে না। ১৫ দিনের কর্মসূচি।

সরাসরি চেনে, আর আমাদের ভাগ্যের সুতো তো রাজ্যের নেতাদের হাতে বাঁধা। ওরা চাইলে মনোনয়ন পাওয়া যাবে, নইলে নয়। তাই মাঝে মাঝে হতাশায় ভুগি। ও বলল, কেন, তোমাকে ইন্দিরাজি চেনে না? আমি বললাম, আমার তো তা-ই ধারণা। ও তখন আর কিছু বলল না।

পরদিন দুপুরবেলা ও বার হচ্ছে। আমাকে ডেকে বলল, 'ডিপিজি, আইয়ে।' আমি বললাম, 'কোথায়?' ও বলল, 'চলিয়ে না।' আর কথা না বাড়িয়ে ওর গাড়িতে উঠে বসলাম। গাড়ি সোজা ১, আকবর রোডে পৌঁছে গেল। ও ভিতরে যাচ্ছে। আমি রিসেপশনে বসে পড়লাম। ও বলল, 'ইহাঁ কিউঁ বৈঠতে হো? আও।' আমি পিছন পিছন রওনা দিলাম। দেখলাম সোজা ১, সফদরজং রোডে যাচ্ছে। অর্থাৎ ইন্দিরাজির বাসভবন। বাইরের ঘরে ধাওয়ান সাহেব ছিলেন। উনি গুলাম নবিকে বললেন, 'জাইয়ে, ম্যাডাম আপকা পুছ রহিথি।' আমি তখনও দ্বিধায়। ধাওয়ানের ঘরে বসে রইলাম। গুলাম নবি হঠাৎ পিছন ফিরে আমাকে না দেখে আবার ফিরে এসে বলল, 'অরে, তুম অন্দর কিউঁ নহি আ রহে হো?' আমি কুণ্ঠার সঙ্গে বললাম, আমি যাব? ও বলল, 'তো লায়ে হ্যায় কিস লিয়ে?' আর দ্বিধা নয়। আমি ওর সঙ্গে ইন্দিরাজির বসার ঘরে পৌঁছে গেলাম। উনি এলেন। একটা সাদা কুর্তা ও মেখলা পরনে। একেবারেই ঘরোয়া পোশাকে। আলোচনা শুরু হল। ২৩ জুন থেকে পক্ষকালব্যাপী কর্মসূচি নেওয়া হবে 'সঞ্জয় পাখোয়ারা'। অন্তর্নিহিত অর্থ ছিল এটা বোঝানো যে, সঞ্জয় গান্ধির স্মৃতিকে হাইজ্যাক করা যাবে না। ১৫ দিনের কর্মসূচি। কী কী করা হবে তা-ই নিয়ে আলোচনা। ধীরে ধীরে এক কথায়-দু'কথায় আমিও আলোচনায় ঢুকে পড়লাম। ইন্দিরাজি সমান গুরুত্ব দিয়ে আমার কথা শুনলেন। এবং একবারও মনে হল না, উনি আমাকে চেনন না বা আমাকে কেন নিয়ে আসা হয়েছে, তা নিয়ে ওঁর কোনও ভ্রুকুঞ্চনও দেখা গেল না। ঠিক হল, আমরা কেন্দ্রীয় স্তর থেকে বিভিন্ন রাজ্যে পক্ষকালব্যাপী জেলায় জেলায় সভা করে সঞ্জয়জি স্বল্প জীবনে যে উদ্যোগগুলো নিয়েছিলেন, তার প্রাসঙ্গিকতা দেশের যুব কর্মীদের ব্যাখ্যা করে বলব, যাতে কাজের ভিতর সঞ্জয়জির লেগাসিকে বাঁচিয়ে রাখা যায়। আমি পরে এই দায়িত্ব নিয়ে মহারাষ্ট্রের সব ক'টা জেলা পরিক্রমা করেছিলাম। সে অন্য গল্প।

যা-ই হোক, ইন্দিরাজির ঘর থেকে বেরিয়ে এসে গুলাম নবি বলল, 'অব পতা চলা না, কি ম্যাডাম আপকো ভি জানতি হ্যায়।' আমি বললাম, হ্যাঁ, এর পর তো চেনে না বলবার কোনও সুযোগ নেই।

মহারাষ্ট্র সফরও মনে রাখার মতো। রঞ্জিত দেশমুখ রাজ্য যুব কংগ্রেস সভাপতি। এক অ্যাম্বাসাডরে ছ'জন। গরমের দিন। এক জেলা থেকে আর-এক জেলা— সকাল, বিকেল, রাত্রি লাগাতার মিটিং। আমার হিন্দি তখনও বাধো বাধো। আর গ্রামীণ মহারাষ্ট্রে মারাঠি ছাড়া কেউ কিছু বলছে না। তবুও আমি সবার কথাই কিছুটা বুঝতে পারছি। এক, মারাঠিতেও বাংলার মতো 'ছে'র প্রাদুর্ভাব। দুই, এই প্রথম বুঝলাম, মানুষ যখন কথা বলে, তখন শুধু মুখ নয়, তার শরীরী ভাষাও পড়তে হয়। সেখান থেকেও বার্তা উঠে আসে। এই সফরের সুবাদেই আমার অজন্তা-ইলোরা দেখার সুযোগ হয়েছিল।

(ক্রমশ)

শিক্ষাশ্রী-কন্যাশ্রী-সবুজসাথী— সব ক'টা প্রকল্পই বেশ ভাল চলছে মাথাভাঙা ১ নং পঞ্চায়েত সমিতিতে

বাঁ দিকে মডেল টয়লেট, ডান দিকে কিষাণ মাণ্ডি

শিক্ষাশ্রী-কন্যাশ্রী-সবুজসাথী— বর্তমান তৃণমূল সরকারের সব ক'টা প্রকল্পই বেশ ভাল চলছে মাথাভাঙা ১ নং পঞ্চায়েত সমিতিতে। কন্যাশ্রী প্রকল্পে পুরস্কার পেয়েছে মাথাভাঙার এই ব্লক, জানালেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আবু তালেব আজাদ। বললেন, সবার আগে এখানে আমরা সাইকেল বিতরণ শেষ করেছি। এখানকার স্কুলগুলোতে ডাইনিং শেডের অভাব ছিল। কিছুদিন আগে MSK, SSK, জুনিয়র হাই মিলে মোট ১৪১টা স্কুলে ডাইনিং রুম করার জন্য একটা ফান্ড পেয়েছি। আগামী দিনে আমাদের এখানকার প্রত্যেকটা স্কুলের বাচ্চারা যাতে শান্তিতে নিজেদের মিডডে মিল খেতে পারে, তার জন্য ডাইনিং শেড থাকবে। স্কুলগুলোর জন্য যে আমরা এটা করতে পেরেছি— এটা আমাদের একটা বড় পাওনা। এখানে একটা পলিটেকনিক কলেজ তৈরি হয়েছে। তৈরি হয়েছে একটা গ্রন্থাগার।

'মিশন নির্মল বাংলা'র জন্য বিডিও থেকে শুরু করে নিজেরাও দিনের পর দিন ভোররাতে উঠে মানুষকে সচেতন করেছেন বলে জানালেন সভাপতি। বললেন, আমাদের পঞ্চায়েত সমিতি নির্মল ঘোষিত হয়ে গিয়েছে আগেই, কিন্তু আমাদের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ হল এটাকে ধরে রাখা।

কৃষিক্ষেত্রেও আমরা সরকারি স্কিমগুলো কাজে লাগাচ্ছি, বললেন আবু তালেববাবু। তিনি আরও বলেন, আমাদের পঞ্চায়েত সমিতি ঠিক করেছে, স্টেট ফিনান্সের টাকা থেকে কৃষকদের জন্য কৃষির উপকরণ কিনে দেওয়া হবে। পচাগড় গ্রাম পঞ্চায়েতে আমাদের কিষান মাণ্ডি চালু হয়ে গিয়েছে। সেখানে ধান

পঞ্চায়েত সমিতিতে ঝাঁ চকচকে কনফারেন্স রুম

কেনাবেচা হচ্ছে। আমরা সেখানে সবজি বাজারও চালু করেছিলাম। কিন্তু বিদ্যুৎবিভ্রাটে তা বন্ধ হয়ে যায়। তবে ফের তা চালু করা হবে বলে তিনি দাবি করলেন। এখানে বিনা কর্ষণে চাষে কৃষকদের উৎসাহিত করার চেষ্টা করছেন বলে জানালেন তিনি। এ ছাড়াও এখানে কৃষক-সচেতনতা শিবিরও করা হয়।

মৎস্য দপ্তরের প্রচুর কাজ হয়েছে এই গ্রাম পঞ্চায়েতগুলোতে, বললেন সভাপতি। জানালেন, প্রথম দু'বছর বিভিন্ন উপকরণ থেকে শুরু করে মাছের চারা পর্যন্ত আমরা মৎস্যজীবীদের বিতরণ করেছি। কিন্তু গত দু'বছর ধরে জেলা মৎস্য দপ্তর থেকে আমাদের কিছু দিচ্ছে না বলে জানালেন সভাপতি। মৎস্য দপ্তর জেলা পরিষদের মাধ্যমে সবকিছু করার ফলে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলো কিছুই পাচ্ছে না। খুব কম সংখ্যক মৎস্যযান আমরা পেয়েছি, সেগুলো বিলি করাও হয়ে গিয়েছে। এখানে প্রায় ২০০০ জনের বেশি মৎস্যজীবী রয়েছে। গত বছর থেকে আমরা টার্গেট নিয়েছি যে, আমরা তাদের আইডেন্টিটি কার্ড দেব। অনেক মৎস্যজীবী ভাতাও পাচ্ছে। আমাদের পঞ্চায়েত সমিতির নিজস্ব সাত বিঘার একটা পুকুর আছে। সেটা আমরা সংস্কার করেছি গত বছর। বন দপ্তর থেকে পুকুরটির সৌন্দর্যায়নের জন্য ৮০০০০ টাকা মঞ্জুর করে দিয়েছে। তা দিয়ে বিউটিফিকেশনের কাজ চলছে। সেখানে প্রচুর মাছও ছেড়েছি। মাছ বিক্রি করে একটা ভাল আয় হবে পঞ্চায়েত সমিতির।

সভাপতি আরও জানান, এখানে ১১/১২টা সমবায় সমিতি রয়েছে। কয়েকটির জন্য আমরা মার্কেট কমপ্লেক্স তৈরির কথাও ভাবছি। আমাদের জিপি-তে ১০টা সেল্ফ হেল্প গ্রুপ রয়েছে, সেগুলোকে সমবায় সমিতিতে রেজিস্টার করা হচ্ছে। পানীয় জল নিয়ে একটা সমস্যা রয়েছে। পিএইচই-তে আমরা প্রস্তাব পাঠিয়েছি। আশা করি সুরাহা হবে। কুর্শামারিতে রানিং ওয়াটারের প্রস্তাব মঞ্জুর হয়েছে। তৃতীয় অর্থ কমিশনের মাধ্যমে এবারও আমরা ডিপ টিউবওয়েল বিতরণ করব, যাদের পানীয় জলের সমস্যা রয়েছে, তাদের। ব্লকে এত বড় একটা সাব-স্টেশন হওয়াতে বিদ্যুৎ নিয়ে কোনও সমস্যা নেই। গরিব মানুষদের জন্য গীতাঞ্জলির ঘর দেওয়া হচ্ছে।

এখানে প্রতিবন্ধী আইডেন্টিফিকেশন ক্যাম্প করে ৬০০ জন প্রতিবন্ধীকে আই-কার্ড দেওয়া হয়েছে। ক্যাম্প করে হুইলচেয়ার, কানের যন্ত্র ইত্যাদি দেওয়া হয়েছে। এসবই করেছি নিজেদের উদ্যোগে, বললেন তিনি। চেনাকাটায় মার্কেট কমপ্লেক্স করার জন্য ৭০ লক্ষ টাকা মঞ্জুর হয়েছে। কাজ চলছে। সেখানে সামান্য টাকা সেলামির বিনিময়ে স্টল দেওয়া হবে। এতে পঞ্চায়েত সমিতির আয় বাড়বে বলে জানালেন আবু তালেববাবু।

নিজস্ব প্রতিনিধি

নির্মল ঘোষণা হওয়ার পর ৫ লক্ষ টাকার ইনসেটিভ পেল মাথাভাঙা-২ পঞ্চায়েত সমিতি

উপরে বাঁ দিকে রান্নার শেড, ডান দিকে বন্যা থেকে বাঁচার জন্য ফ্লাড সেন্টার
নিচে বাঁ দিকে বিএল ও এলআরও অফিস, ডান দিকে তৈরি হচ্ছে প্রস্তাবিত পাওয়ার স্টেশন

'মিশন নির্মল বাংলা'য় গোটা পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে কোচবিহার জেলা প্রথম স্থান অধিকার করেছে। স্বাভাবিকভাবেই জেলাকে নির্মল হতে সাহায্য করেছে প্রত্যেকটা পঞ্চায়েত সমিতি। মাথাভাঙা ২ নং পঞ্চায়েত সমিতি এর বাইরে নয়। এখানে নির্মল বাংলা করার উদ্দেশ্যে মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করার জন্য যেমন প্রচার হয়েছিল, তেমনই সকল মানুষ এতে সাড়াও দিয়েছিল বলে জানালেন মাথাভাঙা ২ নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি উমাকান্ত বর্মন। বললেন, এখানে যেসব বাড়িতে পায়খানা ছিল না, তার সম্পূর্ণ তালিকা তৈরি করে প্রত্যেকের বাড়িতে তা প্রকল্পের মাধ্যমে করা হয়েছে। আমাদের গ্রাম পঞ্চায়েত নির্মল ঘোষণা হওয়ার পর ৫ লক্ষ টাকার একটা ইনসেটিভ পেয়েছিল। আমরা ঠিক করেছি, এরকম যদি কোনও পরিবার এখনও থেকে থাকে, যাদের পক্ষে পায়খানা তৈরি করা একেবারে অসম্ভব ব্যাপার, তাদের এই টাকা থেকে সাহায্য করা হবে।

পানীয় জল নিয়ে এখন কোনও সমস্যা নেই। পানীয় জলের কাজ এখানে ভালই হচ্ছে। আমাদের ১০টা গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে পিএইচই-র কাজ আটটাতে সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। একটাতে কাজ চলছে, আর একটার জন্য অ্যালটমেন্ট এই বছরেই পাওয়ার কথা। এটা হয়ে গেলে এখানে সব ক'টি গ্রাম পঞ্চায়েতে একটা করে পিএইচই থাকবে। এ ছাড়া সব বাড়িতেই টিউবওয়েল তো রয়েইছে, বললেন সভাপতি।

বিদ্যুতের অবস্থা এই পঞ্চায়েত সমিতির সব ক'টি গ্রাম পঞ্চায়েতে বেশ ভাল বলে জানালেন উমাকান্তবাবু। এখানের ৯৯ শতাংশ বাড়িতে বিদ্যুৎ পৌঁছে গিয়েছে। এই মুহূর্তে একটু লো ভোল্টেজ থাকলেও এর মধ্যেই সেই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে বলে জানালেন তিনি। বললেন, আমাদের ব্লকেই নতুন দুটো সাব-স্টেশন হচ্ছে। ফুলবাড়িতে একটা সাব-স্টেশনের কাজ প্রায় ৯০ শতাংশ শেষ। আশা করছি, আর মাস দেড়েকের মধ্যেই তা চালু হয়ে যাবে। অন্যটা হচ্ছে ঘোকসাডাঙায়। এই দুটো চালু হয়ে গেলে মনে হয় আমাদের গ্রাম পঞ্চায়েতগুলো চব্বিশ ঘণ্টা লোডশেডিং ফ্রি জোন হয়ে যাবে। এক কথায়, উন্নয়নের কাজ যে এখানে বেশ জোর কদমেই হচ্ছে তা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না বলে দাবি করলেন সভাপতি মহাশয়।

নিজস্ব প্রতিনিধি

সম্ভবত সেই আনন্দ পথের খোঁজ পেয়েছিলেন শংকরদা

তখন সন্ধে সাতটা। তখনও বাড়ি ফেরেননি শঙ্করদা। অন্য দিনও অবশ্য ফেরেন না। তবে আজকের বাড়ি ফেরাটা একটু অন্যরকম। আর পাঁচটা দিনের মতো আজ তো আর সাইকেল চালিয়ে বাড়ি ফিরবেন না তিনি। বাড়ির মোড় থেকে গোটা রাস্তা জুড়ে অপেক্ষাকৃত শত শত মানুষের মধ্যে দিয়ে অ্যাম্বুলেন্সে করে বাড়িতে ফিরবে তাঁর নিথর দেহ। শেষবারের মতো।

বাড়ির ভিতরের ঘরে অদ্ভুত এক শূন্য দৃষ্টি নিয়ে কেঁদে যাচ্ছিল বছর আটাশের ছেলেটা। মুখে কথা নেই। খবরটা জানার পর থেকেই শুধু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রয়েছে। চোখ দিয়ে অবিরাম গড়িয়ে পড়ছে জল। বয়স্কা মা মাথায় হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিচ্ছে, 'কাঁদিস না বাবা, আমি বুঝতে পারছি তোর ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। কী করবি বল! কষ্ট পাস না।' এক মুখ যন্ত্রণা নিয়ে ছেলেটির চোখ খুঁজে যাচ্ছিল জেঠুকে। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ছেলেটি আপাতদৃষ্টিতে শঙ্করদার কেউ হয় না। ওর নাম সায়ন্তন সেনগুপ্ত— মানসিক বয়স ১২/১৩ বছর। শঙ্করদার মানসসন্তান আনন্দম কালচারাল সেন্টার-এর সদস্য সে। এখানে এলে সে অনেক বন্ধু পায়, সঙ্গে অনেক ভালবাসা। এরাই শঙ্করদার আপনজন।

আর-একজন দীপক চক্রবর্তী। তিনি অনুভব করার জন্য আর সব কিছু পেয়েছেন। শুধু পাননি শোনা আর বলার ক্ষমতা। দাদা নেই, খবরটা বুঝতে পারার পর থেকে কষ্টে ছটফট করছেন তিনিও। আনন্দম-এর জন্যই তো তিনি আজ শিল্পী হতে পেরেছেন। দিল্লির দর্শকদেরও দেখাতে পেরেছেন মূকাভিনয়। দাদার উপরে সম্পূর্ণ ভরসা করেন ৫৫ বছরের এই মানুষটি। ১৯৮০ সালে আনন্দম-এর শুরু থেকে শঙ্করদার সঙ্গী তিনি। বারান্দায় দাঁড়িয়ে তাঁর চোখ বারবার বাইরে চলে যাচ্ছে। শঙ্করদা এই মানুষটিরও পরমাত্মীয়।

বাড়ির অন্য দিকে একটা জটলা থেকে আসছে ফুঁপিয়ে কান্নার আওয়াজ। ওরাও আনন্দম-এর প্রাণ। এখানে ওরা কেউ কাজের লোকের মেয়ে বা দিনমজুরের ছেলে নয়— সবাই শিল্পী। এই জায়গাটা প্রিয়াঙ্কা-রিয়াদের সেকেন্ড হোম। জেঠুর খবর শুনে ছুটে এসেছে অসময়ে। প্রতি রবিবার এখানে কত্ত কিছু শেখে ওরা! মেয়ে হয়ে জন্মানোর অপরাধে মা-সহ তাকে ত্যাগ করেছে নিজের বাবা। এবার সে মাধ্যমিক দেবে, সেটাও তো এই জেঠুরই উৎসাহে। অভিনয় শেখানোর সময় মাঝেমধ্যেই মৃত্যুর অভিনয় করত জেঠু। মাটিতে শুয়ে পড়ে বলত, 'ভাব আমি মরে গিয়েছি... এবার দেখি

তো কে কত সুন্দর কান্নার অভিনয় করতে পারিস।' আজও যেন তেমনটাই হয়... জেঠু যেন উঠে বলে, বাঃ, এই তো, ভালই অভিনয় হয়েছে তোদের।

১৯ ফেব্রুয়ারি বেলা ২.১৭ মিনিট। মাথাভাঙার নজরুল সদনে নাটকের একটি কর্মশালায় মঞ্চেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন শঙ্কর দত্তগুপ্ত। যোগ্য উত্তরসূরি তৈরি করেছিলেন মেয়েকে। মূকাভিনয়ে রাজ্যে প্রথম হয়েছে সে। তাকে নিয়ে লিখব বলে কয়েক দিন আগেই গিয়েছিলাম শঙ্করদার বাড়ি। ফোনে খবরটা শোনার পর বিশ্বাসই করিনি। তার কিছুক্ষণ আগেই যে দু'বার কথা হয়েছে শঙ্করদার সঙ্গে। শেষ কথা হয় ১২.৩৭ মিনিটে। রাখার আগে বললেন, 'এবার কিন্তু আমার মোবাইল সুইচ অফ হয়ে যাবে, আমাকে আর পাবি না।' তাই অবিশ্বাসী মন নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে শঙ্করদাকেই ফোন করি, রিং হয়ে যায়...। অস্থিরতা বাড়তে থাকে। তারপর এক বন্ধু সাংবাদিককে ফোন করলে সেই নিদারুণ সংবাদ পাই। আদ্যন্ত মঞ্চ-পাগল মানুষটা মঞ্চ থেকেই বিদায় নিয়েছেন। একজন অভিনেতার জন্য এটাই বোধহয় শ্রেষ্ঠ মৃত্যু।

পেটের তাগিদে সাংবাদিকতা করলেও শঙ্কর দত্তগুপ্তর সম্পূর্ণ ভালবাসা ছিল নাটক আর মূকাভিনয়ের প্রতি। কোনও অনুষ্ঠানে তাঁকে সাংবাদিক হিসেবে পরিচয় করালে খুব রেগে যেতেন। কোচবিহার পলিটেকনিক থেকে পাশ করেন ইলেকট্রিক্যাল নিয়ে। চাকরি কিছুদিন করে ছেড়ে দেন। এর পর ১৯৭৮ সালে কলকাতা গিয়ে মাইমচর্চা। যদিও বাবার একদম সায় ছিল না এতে। কলকাতায় থাকার সময় তাঁর বন্ধু 'কোরাস ৮১'-র পলু ঘোষের অবদানের কথা পরবর্তীতে নানা জায়গায় বারবার স্বীকার করেছেন। এর পর দু'বছরের মাথায় হঠাৎই মায়ের মৃত্যুসংবাদ। ফিরে আসেন কোচবিহারে, তবুও শেষ দেখা হয় না মায়ের সঙ্গে। সে সময়ই ১৯৮০ সালে মূকাভিনয় শিক্ষার জন্য সুইডেনের ওলে ব্রেক মাইম থিয়েটার থেকে স্কলারশিপের আমন্ত্রণ পেলেও মায়ের মৃত্যুর জন্য সেখানে যেতে পারেননি। এক তীব্র যন্ত্রনা থেকেই ওই বছরই ১৫ আগস্ট জন্ম হয় আনন্দম-এর। আনন্দম কালচারাল সেন্টার শঙ্করদার কাছে সন্তানের মতো। নিজের স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের মধ্যেও আনন্দম-এর প্রতি এই ভালবাসা সঞ্চার করতে পেরেছিলেন সুন্দরভাবে। স্ত্রী শিবানী ছাড়াও মেয়ে ও দুই ছেলে প্রত্যেকেই অভিনয় করে ভালবেসে। মনেপ্রাণে শিল্পী ছিলেন, আর সেই সত্তাটাকেই মানুষের সামনে তুলে ধরতে এত কঠিন সাধনা করতেন শঙ্করদা। সদাহাস্যময়, গম্ভীর কণ্ঠস্বরের এই মানুষটি বাচ্চাদের নিয়েই মেতে থাকতে ভালবাসতেন। সমাজে যারা পিছিয়ে আছে, সেইসব নিম্নবিত্ত পরিবারের বাচ্চাদের নিয়েই চলত তাঁর নাটক, মূকাভিনয়চর্চা। বিখ্যাত মূকাভিনয় শিল্পী যোগেশ দত্ত মাইম শেখানোর সময় শঙ্করদার কাছ থেকে একটি পয়সাও গুরুদক্ষিণা নেননি। নিজেও তাই এত বছর ধরে বিনি পয়সায় সকলকে মূকাভিনয় শিখিয়ে গিয়েছেন। এখন প্রায় ১৫/১৬ জন বাচ্চা রয়েছে আনন্দম-এ। মোট সদস্যসংখ্যা ৫০। সকলকে হাতে ধরে অভিনয় শিখিয়েছেন। মেয়েকে নাচ শিখিয়েছেন শিক্ষক রেখে। কিন্তু পরবর্তীতে নাচের স্কুল খুলতে দেননি। বলেছেন, যারা কখনও পয়সা দিয়ে নাচ শিখতে পারবে না, তুমি তাদের শেখাও। আনন্দম-এর এই কচিকাঁচাদের মন দিয়ে শিখিয়েছে সুকন্যা। তাদের দিয়ে মঞ্চে পরিবেশন করিয়েছে 'চণ্ডালিকা', 'বাল্মীকি প্রতিভা', যা দর্শকদের মুগ্ধ করেছে। প্রতি রবিবার বাড়ির বারান্দা আর উঠোন জুড়ে চলত নাটকের কর্মশালা। এ যেন এক উৎসব। সমাজের কাছে যারা ব্রাত্য, শঙ্করদার কাছে তারাই ছিল

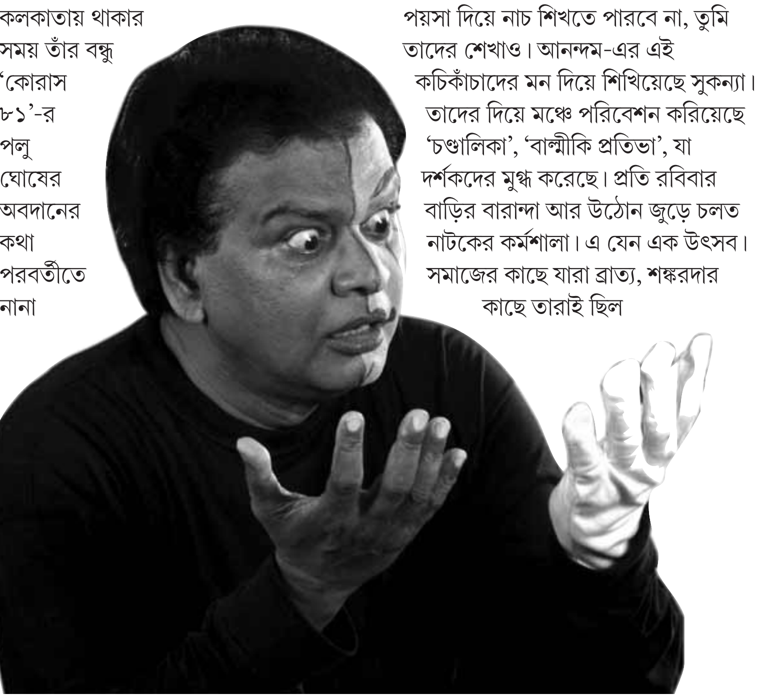

শঙ্কর দত্তগুপ্ত

আপনজন। তাদের সবার একটাই পরিচয়, সকলেই আনন্দম পরিবারের সদস্য। সকলের নিয়মিত খোঁজখবর নিতেন। কারও খাতা কিনে দেওয়া, কারও টিউশনের ফি দিয়ে দেওয়া— এগুলো লেগেই থাকত। গোটা ভাবনাটাই ছিল এই কচিকাঁচাদের ঘিরে। নতুন সংযোজন হয়েছিল পুতুলনাটক। তাঁকে কোচবিহারের মাইমচর্চার পথিকৃৎ বললেও বেশি বলা হয় না। প্রতি বছর নাট্য উৎসব, গরমের ছুটিতে নাট্য কর্মশালা ছাড়াও বেশ কয়েকবার কোচবিহারে ইন্টারন্যাশনাল মাইম ফেস্টিভ্যাল-এর আয়োজন করেছিলেন তিনি। এগুলোই ছিল তাঁর জীবনের অক্সিজেন।

১ জানুয়ারি কোচবিহার রবীন্দ্রভবনে পরিবেশিত মহাভারতের কাহিনি অবলম্বনে রচিত 'পারসব' নাটকটি শঙ্করদার জীবনের শেষ অভিনয় হয়ে থাকল। এখানে বিদুরের চরিত্রটি করেছিলেন তিনি। সে দিন শরীর অসম্ভব খারাপ ছিল। তা-ও চালিয়ে গিয়েছিলেন অভিনয়। নাটক শেষ হয় বিদুরের মৃত্যু দিয়ে। সেখানে দেখানো হয়, বিদুরের শারীরিক মৃত্যু হয়েছে, কিন্তু তাঁর শরীর থেকে একটা শক্তি বার হয়ে তাঁর পুত্রসম প্রিয় যুধিষ্ঠিরের মধ্যে মিশে যায়। শঙ্করদার আত্মজা সুকন্যার কথায়, 'সে দিন বাবার নিস্পন্দ শরীরের পাশে বসে থেকে মনে হচ্ছিল, নাটকের শেষ দৃশ্য হচ্ছে... বাবার দেহের মৃত্যু হয়েছে... একটা ইচ্ছেশক্তি যেন বাবার শরীর থেকে বেরিয়ে আমাদের আনন্দম-এর সবার মধ্যে মিশে যাচ্ছে।' এতদিন যে আনন্দ পথের সন্ধানে ছিলেন শংকরদা, সম্ভবত শেষ পর্যন্ত তার খোঁজ পেয়ে গিয়েছিলেন। সে জন্যই বোধহয় এত তাড়াহুড়ো করে তাঁর চলে যাওয়া।

তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস

ছবি: হিমাংশু রঞ্জন দেব

বাপ কা বেটি তিন্নির মন্ত্র দ্য শো মাস্ট গো অন

শ্রীমতী ডুয়ার্স

গত সংখ্যার প্রতিশ্রুতি মতো এবারের শ্রীমতী ডুয়ার্স সুকন্যা দত্তগুপ্ত। এই প্রতিবেদন প্রকাশিত হওয়ার আগেই ১৯ ফেব্রুয়ারি বাবার অকস্মাৎ মৃত্যু সুকন্যার জীবনের ছন্দ ওলটপালট করে দিয়েছে। কিন্তু বিন্দুমাত্র দমবার পাত্রী নয় সে। ২৪ ফেব্রুয়ারি জলপাইগুড়িতে জাতীয় মূকাভিনয় উৎসবে যোগ দিতে যাওয়ার সময় তার মুখে বাবার শেখানো সেই একই মন্ত্র উচ্চারণ, 'দ্য শো মাস্ট গো অন'।

'কলেজ ফেস্টে ১০৪ জ্বর গায়ে যে দিন "চণ্ডালিকা" নৃত্যনাট্য করছি, সে দিন মাথায় শুধু একটা কথাই ঘুরছিল, "দ্য শো মাস্ট গো অন।" আমার শরীর খারাপের জন্য প্রোগ্রামে যেন কোনও ব্যাঘাত না হয়।' বলছিল সুকন্যা। আর সত্যিই সে দিন ওর অভিনয় এবং পরবর্তী পর্যায়ে ধ্রুপদী নাচ দেখে কোনও দর্শক বিন্দুমাত্র ধারণা করতে পারেননি ওর শারীরিক অবস্থার কথা। সুকন্যার মুখ থেকে ওর নিজের গল্পগুলো শুনব বলে সে দিন গিয়েছিলাম ওদের বাড়িতে। সুকন্যা এখন কোচবিহার শহরে

পাঠকের দাবিতে আবার শুরু হল জনপ্রিয় কলম 'ডুয়ার্সের ডিশ'। এবার থেকে ডুয়ার্সের রাঁধুনিরা হাজির করবেন রন্ধনশৈলীর নানা এক্সপেরিমেন্ট। সূচনা করলেন **শ্রাবণী চক্রবর্তী**, যাঁর হাতের রান্নায় মমত্ব ও জাদু দুই-ই আছে।

ডুয়ার্সের ডিশ

রাই শাকে টাকি মাছ

উপকরণ

একটু বড় সাইজের টাকি মাছ ৪টে, কচি রাই শাকের পাতা ৮-১০টি, আদা কুচি ১ চা-চামচ, রশুন কুচি ১ চা-চামচ, বড় পেঁয়াজ কুচি ১টা, কাঁচালংকা কুচি ৩-৪টে, টম্যাটো ১টা (বিচি ফেলে ছোট করে কাটা), ধনেপাতা আন্দাজমতো, সরষের তেল ৫-৬ চা-চামচ, নুন আন্দাজমতো।

পদ্ধতি

মাছ ভাল করে মাথা বাদ দিয়ে কাটতে হবে। তারপর নুন-জলে ধুয়ে সেদ্ধ করতে হবে। ১০ মিনিট সেদ্ধ হওয়ার পর মাছ ঠান্ডা হলে কাঁটা বেছে নিতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে, মাছের কোনও কাঁটা যেন না থাকে। কড়াইতে সরষের তেল দিয়ে তেল গরম হলে কাঁচালংকা ফোড়ন দিতে হবে। তারপর একে একে আদা, রশুন, পেঁয়াজ, কাঁচালংকা কুচি দিয়ে ভাল করে নাড়াচাড়া করে কাঁটা ছাড়ানো মাছটা ওই কড়াইতে দিয়ে ভাল করে কষে নিতে হবে। কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে কুচোনো রাই শাক দিতে হবে। শাক থেকে জল বার হয়ে মাছের সঙ্গে মিশে যাবে। জল শুকিয়ে বেশ একটু মাখা মাখা হলে ধনেপাতা কুচি দিয়ে নামিয়ে নিতে হবে। গরম বাসমতী চালের ভাতের সঙ্গে প্রথম পাতে খান, দেখবেন দুপুরের খাবার কেমন জমে যাবে।

বেশ পরিচিত নাম। আর রাজ্যস্তরে ছাত্র যুব উৎসবে কোচবিহার জেলাকে প্রথম পুরস্কার এনে দিয়ে সে এখন রীতিমতো বিখ্যাত।

জন্ম থেকেই বড় হয়েছে নাটক আর মূকাভিনয়ের পরিমণ্ডলে। বাবা শঙ্কর দত্তগুপ্ত পেশায় সাংবাদিক হলেও নেশা মূকাভিনয়। মাইম সম্রাট যোগেশ দত্তর ছাত্র হবার সুবাদে বাবাকে সাংবাদিকতার পাশাপাশি মূকাভিনয় করতে দেখেছে জ্ঞান হওয়া থেকেই, জানাল সুকন্যা। তাঁর হাত ধরে সেই তিন বছর বয়সে শুরু নাটক আর মূকাভিনয়ের পথে যাত্রা। বাবার প্রতিষ্ঠিত আনন্দম কালচারাল সেন্টারে ছোটদের নিয়ে নাটক করানো হত। তাই ছোট থেকেই সেইসব নাটকে অভিনয়ে হাতেখড়ি হয়। এর পাশাপাশি চলেছে বিভিন্ন জায়গায় নাটকের কর্মশালায় অংশ নেওয়া। সেই কারণে রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, দেবশংকর হালদার, তীর্থঙ্কর চন্দর মতো নানা ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্যে আসারও সৌভাগ্য হয়েছিল। নাটক করতে গেলে সব ধরনের শিল্প লাগে। তাই কোচবিহারের রূপালী বর্মন, অর্পিতা বর্মনের কাছে নাচেরও প্রথাগত তালিম নিয়েছে সেই ছোট থেকে। সেটাও অবশ্য বাবারই আগ্রহে। সুকন্যার কথায়, ‘বাবা বলে, পড়াশোনা করেও নাটক, নাচ, মূকাভিনয় চর্চা করা যায়। ঘুরে বেড়িয়ে আর টিভি দেখে সময় নষ্ট না করে সময়গুলো অন্যভাবে কাজে লাগানো যায়।’ বাবার তৈরি আনন্দম কালচারাল সেন্টার এখন সে নিজেও দেখাশোনা করে। প্রত্যেক বছর গরমের ছুটিতে শিশুদের নিয়ে নাটকের কর্মশালা করা হয়। সাত থেকে আট দিন এই কর্মশালা চলে সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত। প্রতিবারই কোনও না কোনও বিশিষ্ট ব্যক্তিকে নিয়ে আসা হয় বাচ্চাদের নতুন কিছু শেখানোর জন্য। শেষ দিন হয় কর্মশালা নাটক। তাদের গ্রুপে বেশির ভাগ বাচ্চাই আর্থিক দিক থেকে দুর্বল। গত বছর জুন মাসে যে দুটো কর্মশালা হয়েছিল, তাতে ধূমকেতু পাপেট থিয়েটারের গল্প ‘এক বছরের রাজা’ নাটকের চিত্রনাট্য লিখেছিল সুকন্যা নিজে। বাচ্চাদের নিয়ে নৃত্যনাট্যও করিয়েছে সে। ‘চণ্ডালিকা’ যথেষ্ট সফল। পরপর দু’বছর হয়েছিল ‘বাল্মীকি প্রতিভা’। ২৭ জন বাচ্চা কাজ করেছিল ওই নৃত্যনাট্যে।

সুকুমার রায়ের ‘পাজি পিটার’ অবলম্বনে ‘পিটার দি গ্রেট’ নাটকে সুকন্যা অভিনীত লুসি চরিত্র রাজ্যস্তরেও প্রশংসিত হয়েছে। খুব ছোটবেলা থেকে এই চরিত্রে অভিনয় করতে করতে মঞ্চের ভীতি কেটে গিয়েছে, জানাল সুকন্যা। এত বছরে নয়-নয় করে ৭০টা শো হয়েছে এই নাটকের। এ ছাড়াও এখন করছে ‘পার্শ্বব’ ও ‘লেডি ম্যাকবেথ’ নামে দু’টি নাটক। ‘লেডি ম্যাকবেথ’-এ নামভূমিকায় ইতিমধ্যেই বেশ সাড়া ফেলেছে সুকন্যা। সদ্যসমাপ্ত মাথাভাঙা সারস্বত উৎসবে ‘লেডি ম্যাকবেথ’ প্রথম হয়েছে। কিছুদিন আগে কলকাতার শিশির মঞ্চে ‘কলকাতা নাটুকে’র বর্ষা প্রেমের রবি’ নাটকে অভিনয় করে এল। নাটকের গানগুলি গেয়েছেন শ্রাবণী সেন। সে এক দারুণ অভিজ্ঞতা, বলল সুকন্যা। নিজেদের প্রযোজিত দু’টি মূক নাটক ‘আজও নিরুপমা’তে দজ্জাল শাশুড়ির ভূমিকায় এবং ‘একলব্য’ নাটকে মায়ের ভূমিকায় সুকন্যার অভিনয়ও সকলের নজর কেড়েছে। এ বছর কলকাতার নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে রাজ্য ছাত্র যুব উৎসবের ফাইনালে বিভিন্ন জেলা থেকে আসা ১৯ জন প্রতিযোগীকে পিছনে ফেলে মূকাভিনয়ে সে নিয়ে এসেছে সেরার সম্মান। তার জন্যই কোচবিহারের মুখরক্ষা হয়েছে। ডিস্টেন্সে বাংলায় এম এ করে এখন বি এড পড়ছে সুকন্যা। এখানেই শেষ নয়, কলেজের সেকেন্ড ইয়ার থেকে কোচবিহারের লোকাল নিউজ চ্যানেলে নিয়মিত খবরও পড়তে দেখা যায় এই শ্রীমতীকে। সদ্য যোগ দিয়েছে একটি এনজিও-তে কাউন্সিলর হিসেবে। ইচ্ছে থাকলে যে এতটুকু বয়সেও অনেক কিছু করা সম্ভব তা সুকন্যাকে দেখলে বোঝা যায়। তবে এইসব কিছুই হত না, যদি এমন একটা পরিবার সে না পেত, বলল সুকন্যা। বাবা-মা, দুই ভাই সক্কলেই মেতে রয়েছে অভিনয় নিয়ে। বর্তমান সমাজে যা বিরল। অভিনয়কে অন্তরের গভীর থেকে ভাল না বাসলে যা সম্ভব নয়। ভবিষ্যতে নাটক আর মূকাভিনয়কে নিয়েই এগিয়ে যেতে চায় মা-বাবার আদরের তিন্নি। কোচবিহার জেলাসহ গোটা ডুয়ার্স আজ তার জন্য গর্বিত।

তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস

শ্রীমতী ডুয়ার্স ক্লাবের দায়িত্ব ও পরিধি বাড়ল

গত ১১ ফেব্রুয়ারি ‘শ্রীমতী ডুয়ার্স ক্লাব’-এর খোলামেলা আড্ডার পাশাপাশি ছিল কিছু জরুরি আলোচনাও। ১) ক্যামেরা ক্লাবের দায়িত্ব নিতে এগিয়ে এসেছেন নীলাঞ্জনা সিনহা এবং ইন্দ্রাণী গুহ। ইতিমধ্যেই কাজ এগিয়েছে অনেকটাই। ক্যামেরা ক্লাবের সদস্যরা শুধু যে মহিলাই হবে তা নয়, যে কেউ হতে পারে। ক্যামেরা হাতে ঘুরে ঘুরে ছবি তোলার শখ যাদেরই আছে, তারাই হতে পারে ক্যামেরা ক্লাবের সদস্য। ছবি সম্পর্কে খুব কিছু জ্ঞানগম্যি না থাকলেও চলবে। মাঝে মাঝে ফোটো ওয়াক, কর্মশালা, কখনও বা ভাল ফোটোগ্রাফারের কিছু পরামর্শ পাওয়ার জন্য কোনও সেমিনারের আয়োজন— এসবই থাকবে ক্যামেরা ক্লাবে। ক্লাব সদস্যদের ভাল ছবি প্রয়োজনে ছাপা হবে ‘এখন ডুয়ার্স’-এ, হবে প্রদর্শনীও। ২) ছোট বাচ্চাদের নিয়ে শুরু হচ্ছে ‘আবোল তাবোল’ ক্লাব। এটি শ্রীমতী ক্লাবের সদস্যরাই চালাবেন, তবে মূল দায়িত্ব নিয়েছেন ছন্দা রায় ও সীমা সান্যাল চৌধুরী। কচি মুখগুলো খেলতে না পেরে শুকনো মুখে রবিবারটাও স্যারের কাছে পড়তে যায়। কী শাস্তি। ওদের কথা ভেবেই রবিবারটা শুধু ওলটপালট করার জন্য খোলা হচ্ছে এমন একটা ক্লাব। কোনও কিছুই নিয়মমাফিক হবে না সেখানে, কান ধরে মলে দেবে না কেউ। শাস্তির কোনও বন্দোবস্ত থাকবে না। শুধু হাসি-মজা-খেলা আর দুষ্টুমি, সেই সঙ্গে নতুন কিছু জানা, নতুন কিছু শেখা।—

৩) ২৫ ফেব্রুয়ারির আড্ডায় যোগ হল ট্রাভেল ক্লাব। শিলিগুড়ি থেকে এসেছিলেন ব্রততী দত্ত, তাঁর উদ্যোগে ইতিমধ্যেই শিলিগুড়ির সদস্য সংখ্যা ২০ ছুঁয়েছে। মার্চ মাসে মালবাজারে খুলতে চলেছে ‘শ্রীমতী ডুয়ার্স’ ক্লাব। ক্লাবের আড্ডা বসবে শিলিগুড়িতেও। দুটোতেই যোগ দেবেন জলপাইগুড়ির সদস্যরাও। শ্রীমতী ডুয়ার্স ক্লাবের সদস্য হওয়ার জন্য সাড়া পড়ে গেছে কোচবিহারেও। আগামী সংখ্যায় আরও বিস্তারিত খবর।

নিজস্ব প্রতিনিধি

উত্তরঙ্গ তরঙ্গ

৪২

শ্রাবণ মাসের সাত তারিখ আজ। গত চার দিন একনাগাড়ে বৃষ্টির পর আজ দুপুর থেকে মেঘ কেটে গিয়ে নরম রোদ্দুর উঠেছে। বর্ষায় টাউন ফাঁকা ফাঁকা লাগে। চাষবাসের কারণে গ্রামের লোকেরা এই সময় খুব কম আসে। কয়েক দিনের টানা ধারাপাতের কারণে দোকান-বাজার চলছে ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে। তবে আজকের মতো বৃষ্টি থেমে যাওয়ার ফলে বিকেল নাগাদ রাস্তাঘাটে লোকজন, গাড়িঘোড়ার ভিড় বাড়তে শুরু করল। কাঠের গোলায় নিজের ঘরে বসে গোপাল ঘোষ জানলা দিয়ে তাকিয়ে ছিলেন রাস্তার দিকে। তিন-চারজন মিলে তিস্তার জলে ভেসে আসা গাছের কয়েকটি ধরেছে। গোরুর গাড়ি চাপিয়ে সেসব নিয়ে এসেছিল গোপাল ঘোষের গোলায়। তিনি অবশ্য এসব কাঠ কেনেন না। কিন্তু ছেলেদের দাবি, কাঠ বিক্রির পয়সা তারা লাইব্রেরির বই কেনার জন্য দান করবে। এটা শোনার পর গোপাল ঘোষ আর না করেননি।

ছেলেগুলো টাকা নিয়ে চলে গিয়েছে। ঘণ্টাখানেক তাদের সঙ্গে কাঠের দাম, দেশের ভবিষ্যৎ— এসব নিয়ে গল্প করার পর এখন বেশ ফাঁকা ফাঁকা লাগছে গোপাল ঘোষের। বসে থাকতে ইচ্ছে করছে না। তিস্তার জলে ভেসে আসা কাঠ ধরার একটা প্রতিযোগিতা করার কথাও ভাবলেন খানিকক্ষণ। হিদারু না থাকায় স্কুলের জন্য জমি দেখার কাজটা একদম থেমে গিয়েছে। নরম রোদ্দুর-মাখা ভেজা বিকেলের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ভাবলেন, জমি দেখতে বার হওয়া যায় কি না। কিন্তু ভাবার পরেও বিশেষ উৎসাহ পেলেন না। জানলা দিয়ে হাঁক দিয়ে একটা বাদামওয়ালাকে ডেকে ঠোঙা ভরতি চিনেবাদাম কিনলেন। দেখা গেল, বাদাম খাওয়ার ব্যাপারে তিনি বেশ পটু।

হিদারুর চিঠি গত পরশুও এসেছে। সে ভালই আছে। কাঠকলের মালিক সুনীতি দাশগুপ্তর সঙ্গেও পত্রালাপ চলছে গোপাল ঘোষের। তবে পুলিশ এখনও হিদারুর বাড়িতে সপ্তাহে দু’-তিনবার খোঁজখবর নিচ্ছে। সুতরাং, হিদারুর পক্ষে এখন জলপাইগুড়ি ফেরার কোনও সম্ভাবনা নেই। তবে মাথাভাঙা থেকে গগনেন্দ্র এর মধ্যেই আসছে শোভাকে বাপের বাড়িতে

কিছুদিন রেখে যাবে বলে। গোপাল ঘোষের আশা, সে এলে দুটো দিন বেশ উত্তেজনায় কাটানো যাবে।

বাদামের ঠোঙা শেষ করে পুনরায় বিক্রেতাকে পাওয়ার আশায় গোপাল ঘোষ জানলা দিয়ে উঁকি দিলেন। জানলার অদূরেই দিনবাজারের দিকে যাওয়ার রাস্তা। টানা বৃষ্টিতে সে রাস্তার অবস্থা কিছু খারাপ হয়ে থাকায় লোকজন ধুতি হাঁটুর উপরে তুলে সাবধানে নিচের দিকে তাকিয়ে পা ফেলে ধীরে ধীরে যাচ্ছে। সেই লোকজনদের একজনকে দেখে গোপাল ঘোষ বেশ ফুর্তি পেয়ে ডাক দিলেন, 'এই যে নিত্যবাবু! এদিকে! এদিকে!'

নিত্যবাবুর সঙ্গে গোপাল ঘোষের মাঝে মাঝে কথাবার্তা হয়। শোভার বিয়ের কয়েকদিন পর আর্য নাট্যসমাজে নাটক দেখতে যাচ্ছিলেন তিনি। বলা নেই কওয়া নেই, আচমকা আকাশ কালো করে বৃষ্টি আর সঙ্গে শিল পড়তে শুরু করল। মাথা বাঁচাতে ঢাকেশ্বরী ভাণ্ডারে ঢুকে পড়েছিলেন গোপাল ঘোষ। খাদির দোকান বন্ধ করে যতীন রায়ও যাচ্ছিলেন নাটক দেখতে। তিনিও ঢাকেশ্বরীতে আশ্রয় নিলেন। তারপরেই দু'হাত মাথার উপর চাপিয়ে নিত্যবাবুর আগমন। ততক্ষণে দোকানের টিনের চালে শিলাপতনের শব্দে চারদিক মুখরিত।

গোপাল ঘোষ লক্ষ করলেন, মাথা চেপে আসা ব্যক্তিটি পাঞ্জাবির পকেট থেকে একতাড়া কাগজ বার করে মন দিয়ে দেখছে। তাঁর আশঙ্কা ছিল, কাগজগুলো ভিজে গিয়েছে। আশঙ্কা দূর হওয়ার পর কাগজগুলো আবার পকেটে পাঠিয়ে গোপাল ঘোষের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে সে বলেছিল, 'ভিজলে খুব খারাপ হত।'

'ব্যবসার কাগজ বুঝি?' বক্তা বয়সে ছোট তা অনুমান করে গোপাল ঘোষ স্নেহের সুরে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'জরুরি কাগজ ফাইল ভরে নিয়ে বেরুতে হয়।'

সে তখন হেসে বলেছিল, 'আমি গমেন্ট সার্ভিস করি। একটা প্লে লিখেছিলাম তো। নিরুপমবাবুকে শোনাতে এসেছিলাম। তিনি খুব সুখ্যাতি করলেন। কিন্তু গানগুলো শুনে বললেন, রবিবাবুর ডিপ ইনফ্লুয়েন্স পাওয়া যাচ্ছে।'

'আপনি নাটক লেখেন?' গোপাল ঘোষ বেশ অবাক হয়ে জানতে চেয়েছিলেন, 'পকেটের ওটা কি নাটকের ম্যানাস্ক্রিপ্ট?'

সেই থেকেই আলাপ। জলপাইগুড়ি টাউনে সরকারি আপিস কম নয়। কিন্তু সরকারি কর্মচারীদের একটা বড় অংশ শাস্তিমূলক বদলি নিয়ে এসেছেন এখানে। তাঁদের প্রতি ইংরেজ সরকারের কোপদৃষ্টির কারণ হল কর্মচারীদের স্বদেশিপ্রীতি। অবশ্য নিত্যবাবু বদলি হয়ে আসেননি। এখানেই তাঁর প্রথম পোস্টিং। কিন্তু তাঁর গভীর বিশ্বাস এই যে, নাটক লেখার কারণে তাঁকে আলিপুরদুয়ার সাব-ডিভিশনে চলে যেতে হবে।

এর পর মাঝেমধ্যেই দেখাসাক্ষাৎ হয়েছে। নিত্যবাবুকে দেখলে ভালই লাগে গোপাল ঘোষের। অমিয় নামে তাঁর এক শাগরেদ ছিল। সে অবশ্য এখন কলকাতায় গিয়েছে বিলেত যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে। তার কবিত্বশক্তির উপরে আশা ছিল নিত্যবাবুর। বর্তমানে টাউনে বেশ কয়েকটি শিষ্য থাকলেও তাদের মধ্যে কবিত্বশক্তির চিহ্নমাত্র নেই বলে নিত্যবাবুর ধারণা। কিন্তু তারা টাউনে রবি ঠাকুরকে আনতে চায়। এ নিয়েও গোপাল ঘোষের সঙ্গে কথাবার্তা হয়েছিল নিত্যবাবুর। গোপাল ঘোষ আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, রবিবাবুর মতো লোক টাউনে এলে সমস্যা হবে না।

নিত্যবাবু কাদা বাঁচিয়ে আপিসঘরে ঢুকে চেয়ারে ধপ করে বসে বললেন, 'ভাবছি আপনার কাছে আসব। কিন্তু যা ওয়েদার যাচ্ছে।'

'শুনেছি বর্ষা এলে নাকি কাব্যভাবের পুষ্টি হয়।' গোপাল ঘোষ হেসে বললেন।

'সে কালিদাসের দেশে হয়। বাংলা দেশে নয়।' নিত্যবাবুও হাসলেন। তারপর সুর বদলে জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা। বঙ্কিমের খবর কী?'

'সে নিরাপদে আছে। এর বেশি জানতে চাইবেন না।'

'আমি ভাবছি তাঁর ঘটনাটা নিয়ে একটা প্লে লিখব।'

'দারুণ ভেবেছেন তো!' সহসা খুব উত্তেজিত বোধ করে গোপাল ঘোষ স্বমহিমা ধারণ করলেন, 'সেই প্লে-তে আমার ক্যারেকটার থাকবে নিশ্চয়ই?'

'আপনার আর খুদিদার ক্যারেকটার তো থাকবেই। কিন্তু বঙ্কিমের সঙ্গে তো আমার পরিচয় নেই। তাই প্লটটা সাজাতে পারছি না। মানে স্টোরি না পেলে প্লে লিখব কী করে? ক্যারেকটার চাই। সিন ভাগ করতে হবে। তারপর ধরুন, বঙ্কিমবাবুর ছোটবেলা জানতে হবে।'

গোপাল ঘোষ একটু থতমত খেয়ে বললেন, 'হিদারুর ছোটবেলার ঘটনা তো আমার জানা নেই। তবে ওর দাদারা নিশ্চয়ই বলতে পারবে। অনেকগুলো দাদা ওর।'

'অনেকগুলো?' নিত্যবাবুকে চিন্তিত দেখায় যেন, 'নাম্বার অব ক্যারেকটারস তো তাহলে অনেক বেড়ে যাবে।'

'তাতে কী ক্ষতি?' গোপাল ঘোষ জিজ্ঞেস করেন, 'আমি আর্য নাট্যসমাজকে রিকোয়েস্ট করব। তারা সবাই প্লে করবে।

জলপাইগুড়ি টাউনে সরকারি আপিস কম নয়। কিন্তু সরকারি কর্মচারীদের একটা বড় অংশ শাস্তিমূলক বদলি নিয়ে এসেছেন এখানে। তাঁদের প্রতি ইংরেজ সরকারের কোপদৃষ্টির কারণ হল কর্মচারীদের স্বদেশিপ্রীতি। অবশ্য নিত্যবাবু বদলি হয়ে আসেননি।

ক'টা ক্যারেকটার হবে তোমার প্লে-তে? পঞ্চাশ?'

এবার নিত্যবাবু কিঞ্চিৎ ঘাবড়ে গিয়ে বললেন, 'না না!'

আলোচনা ভালই জমে উঠল। বিকেল ফুরিয়ে গেল দেখতে দেখতে। মৈত্র বাড়ির সামনে টিনের লম্বা দোতলা চালাঘরের নীচতলায় ঘোড়ার গাড়ির স্ট্যান্ড থেকে একটা একটা করে গাড়ি বেরিয়ে যেতে লাগল সওয়ারি নিয়ে। দিনবাজার কালীবাড়ির সামনে সুরেন কুঁড়ির মিষ্টির দোকানে বাদাম বরফির টানে ভিড় জমতে শুরু করল। সওদাগরপট্টির পাঞ্জাব শু স্টোরসে আসা হাল ফ্যাশনের পাম্প শু কিনতে এলেন সুবেশ এক বাবু। নকুল ডাক্তারের ডিসপেনসারিতে কংগ্রেস কর্মীরা আড্ডা দেওয়ার অভিলাষে জড়ো হতে লাগলেন। বেঙ্গল ব্যাঙ্ক লাগোয়া জিতেন রায়ের 'লাইট'-এর দোকানে হ্যাজাক, পেট্রোম্যাক্স, গ্যাসলাইট কিনতে এসে ধুন্ধুমার গল্প জুড়ে দিলেন ময়নাগুড়ি থেকে আসা ক্রেতা। পাশেই উপেনবাবুর ফোটোর দোকান।

দিন ফুরিয়ে গেল আরও একটা।

খুদিদার বাড়ির সামনে কেরোসিনের পথবাতির আলোয় সামান্য গলে যাওয়া অন্ধকারে তখন একটা ঘোড়ার গাড়ি দাঁড়িয়ে। তিনি বার হবেন। আজ বিকেলের ডাকেই এসেছে বেয়াইয়ের চিঠি মাথাভাঙা থেকে। মেয়ে-জামাই আগামী সপ্তাহেই আসছে। কিন্তু সেটা ছাড়াও একটা খবর ছিল সেই চিঠিতে, যা জানার পর বাড়িতে আনন্দ থইথই করছে। খবরটা এত ভাল যে, পরিচিত মহলে জানিয়ে আসার জন্য খুদিদার তর সইছিল না।

মা হতে যাচ্ছে তাঁর মেয়ে।

(ক্রমশ)

শুভ্র চট্টোপাধ্যায়

স্কেচ: দেবরাজ কর

পাখি-পাগল শিবুন ভৌমিক

ভাঙা আয়নায় টুকরো ডুয়ার্স

'ওই দেখুন গৌরীদা, রক্তকরবীর ডালে চুপটি করে বসে আছে শ্রাইক। পোকামাকড়, কীটপতঙ্গ পেলেই হল, টুক করে ঠোঁটে গেঁথে ফুড়ুৎ করে পালায়। ওই, ওই যে ডানা মেলল নীলকণ্ঠ।' পাখি চেনার অদ্ভুত দক্ষতা শিবুনের। শুধু পাখি নয়, গাছ, প্রজাপতি, অর্কিড, বন্য পুষ্প, বন্য প্রাণ— সবই শিবুনের চোখে ধরা পড়ে, এবং সঙ্গে সঙ্গে তা ক্যামেরাবন্দি হয়। পঞ্চাশোর্ধ্ব পাখি-পাগল শিবুন সত্যি ডুয়ার্সের রত্ন। খবরের কাগজে নাম ফাটানো, প্রচারের ঢক্কানিনাদ থেকে শিবুন চিরকাল দূরে থাকতেই ভালবাসে। নিজের খেয়ালে আপন মনে ঘুরে বেড়ানো তার নেশা।

পিছুটান মা-র জন্য। যত দূরেই যায়, আবার ফিরে আসে জংশনের রেল কলোনির ছোট্ট কোয়ার্টারে। বিছানা জুড়ে অজস্র পুঁথি-পুস্তক, পত্রপত্রিকা। সবই প্রকৃতি, বন্য প্রাণ, পাখি, প্রজাপতি আর বেড়ানার খোঁজখবর। শিবুনের পেশা ও নেশা মিলেমিশে একাকার। এমনি নেশা যে, চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে স্বাধীনভাবে প্রকৃতির মাঝে একাত্ম হয়ে থাকে। সংসারজীবনে বীতশ্রদ্ধ।

—এই বেশ আছি গৌরীদা। আপনাদের ভালবাসা, উৎসাহ আমার চলার পথের পাথেয়। একদিন তো চলে যেতেই হবে। যতদিন বাঁচি, রূপরসগন্ধস্পর্শময় প্রকৃতিকে চেনাজানার মধ্যে থাকতে চাই। মোটা ভাতেই তুষ্ট। অল্প লইয়া থাকি তাই।

পূর্ব থেকে পশ্চিম ডুয়ার্স, পাহাড়ের আনাচকানাচে, চেনা-অচেনা জায়গায় পৌঁছে যাওয়া এবং তারপর পর্যটকদের খোঁজখবর দেওয়া। চলতে চলতে কত বড় মাপের মানুষকে শিবুন দেখেছে। পেয়েছে অফুরন্ত স্নেহ, ভালবাসা, উৎসাহ। শিবুনের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় শিলিগুড়িতে। আলিপুরদুয়ারের একটি সংস্থা পিপলস ফর অ্যানিম্যালস-এর একজন সদস্য। এই সংস্থাটি এখনও আছে, কিন্তু প্রচার নেই। এদের উদ্দেশ্য একটাই— জীবজন্তু আহত হলে ভালবাসা, মনপ্রাণ দিয়ে সেবাশুশ্রূষা করা। গৃহস্থের বাড়িতে সাপ ঢুকে পড়লে তা ধরা এবং অহেতুক সর্পভীতি থেকে তাদের মুক্ত করা। কুসংস্কার থেকে দূরে থাকা। এদের ভালবাসা-নিষ্ঠার প্রতি আমার সমর্থন সতত। যা-ই হোক, সেই যোগাযোগ আজও অটুট।

একদা আলিপুরদুয়ার গেলে যাঁদের ভালবাসা, বেড়ানোয় সঙ্গীসাথি হিসেবে পেয়েছিলাম, তাঁদের বেশির ভাগই ধরাধাম থেকে বিদায় নিয়েছেন। যাঁরা বেঁচেবর্তে আছেন, বেশির ভাগই বন্দিদশা। শরীরের নাটবল্টু ঢিলেঢালা হচ্ছে। জীবনের প্রতি মনে হয় বিতৃষ্ণা এসেছে। কী হবে আর লিখে? চার দেওয়ালের মধ্যে উটপাখির মতো মাথা গুঁজে পড়ে থাকা। আর বেড়ানো? সুখে থাকতে ভূতের কিল খাওয়া। পুঁথিপুস্তক পড়ে কয়জনে আর কেনে কয়জনে। 'চলো যাই' বললে অনেক বাহানা, অজুহাত। আড্ডা দেবার জায়গা কোথায়? মাধবে, চৌপথিতে, কোর্ট স্টেশনে, হাটখোলায়, ভাঙাপুলে— যেখানেই যাই, খাঁ খাঁ শূন্যতা। কত গেঁজুগপ্প হত তিনুদার প্রেসে, খোকনের চারুমুদ্রণে, নিতাইদার আয়ুর্বেদ ভবনে। মাঝে মাঝে অর্ণবদার বাড়িতে যাই। সুরসিক বাচনভঙ্গি, নানা সংলাপে সময় কাটে। হাঁটুর সমস্যায় আগের মতো দৌড়ঝাঁপ করতে পারেন না। হারু পাল শম্বুকের মতো গুটিয়ে আছেন নোনাইকে বুকে ধরে। একা প্রমোদ এখনও আদিবাসীদের ঘরসংসার, সমাজ-সংস্কৃতির খোঁজখবর নিতে কাছে-দূরে ছোটাছুটি করে। তাই ভরসা এখন শিবুন ভৌমিক। আর কোথাও না হোক, দমনপুরের কাছে নোনাই, ডোরিয়া, গরম নদী, ঘাগরা, বনচুকামারি, বাইরাগুড়ি হয়ে তপনের মুক্ত চা-দোকানে কাঠের বেঞ্চিতে বসে আড্ডা। কখনও সখনও বাপি, জ্যোতি, টাটু— কেউ না কেউ জুটে যায়। সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত তপনের চা-দোকানে গ্রামগঞ্জের মানুষজনের ভিড় হয়। নানারকম গল্প শুনে মজা পাই। সন্ধ্যা হলে মহাকালবাবারা গুটিগুটি পায়ে কিংবা থপথপ করে দোকানের সামনে জড়ো হয়। মাঝে মাঝে ভেঙে দিয়ে চলে যায়।

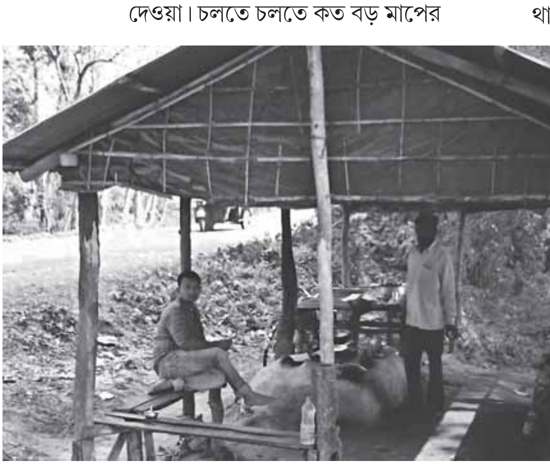

বাইরাগুড়ির মোড়ে তপনের চায়ের দোকান

শিবুনের বেড়ানোর প্রিয় জায়গা রাজাভাতখাওয়া, জয়ন্তি, আঠাশ মাইল, পাটকাপাড়া, কাছেপিঠে যেখানে হোক। হালকা রুকস্যাক রেডি থাকে। ব্যাগের মধ্যে ক্যামেরার পোঁটলা, জলের বোতল, চায়ের ফ্লাস্ক, বিস্কুট, চানাচুর। বাহন কারও গাড়ি কিংবা নিজের ছোট্ট স্কুটি। রাজাভাতখাওয়া যেতে যেতে কিছুটা সময় মধুগাছ, না হলে জাতীয় সড়কের পাশে স্বর্গছেঁড়া উদ্যানে, সিকিয়া ঝোরাতে। মাঝে ফোটোবাবুকে দেখি নোনাই সেতুর কাছে, জঙ্গলে, নদীর ধারে। তিরিশ বছর ধরে ছবি তুলছে দূরপাল্লা পণ্যবোঝাই ট্রাক ড্রাইভার-খালাসিদের। আজব খেলা বটে। রাজাভাতখাওয়া গেলে অবশ্যই পরিমলের ঠেকে। তপনের মতো বিচিত্র চায়ের দোকান চৈতন্যঝোরার পাশে। ভোলাভালা পরিমলের চা-দোকানে দেশ-বিদেশের পর্যটক, ভ্রামণিকের পদধূলিতে ধন্য। যাবতীয় খোঁজখবর মেলে এখানে। হাই বেঞ্চ, লো বেঞ্চ। গরম গরম ঘুগনি, পাউরুটি কিংবা চিঁড়ে সহযোগে খাওয়া, তারপর দে ছুট জয়ন্তির পথে। কখনও আঠাশ মাইল, সান্তারাবাড়ি, জয়ন্তি হয়ে চুনিয়াঝোরা, হাতিপোতা, ভুটানঘাট— ক্লান্তিহীন চরকি পাক। শিবুনের সংগ্রহে শত শত প্রজাপতি, পাখি, বন্য প্রাণীর ছবি জমে জমে পাহাড়। কে ছাপবে? কে দেখবে?

—গৌরীদা, এইসব ছবি দিয়ে ইচ্ছে একটা বই বার করার।

ডুয়ার্সরত্ন শিবুনের ইচ্ছাপূরণ হলে আমার সত্যি আনন্দ হবে। অপেক্ষায় রইলাম।

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য

ছবি: শিবুন ভৌমিক

অরণ্য মিত্র

টিভিতে আচমকা একটা খবর শুনে তাজা হয়ে উঠলেন কনক দত্ত। কন্যাসাথির অফিসে পুলিশ রেইড করেছে। নবেন্দু মল্লিকের সঙ্গে কোনওভাবে কন্যাসাথির সম্পর্ক আছে কি? অন্য দিকে, আসরে নেমে পড়েছেন বুদ্ধ ব্যানার্জি। 'ব্ল্যাক বেঙ্গল'-এর কাজ শুরু করার জন্য তিনি ভাবছেন পঁচিশে বৈশাখের কথা। বোঝা গেল, ডার্ক ক্যালকাটার সুরেশ কুমার আসলে তাঁরই লোক। কিন্তু ক্যাভেন্ডিস কি ছেড়ে দেওয়ার পাত্র? কন্যাসাথির তুচ্ছ কর্মী শুক্লা দাসের স্বরূপও উন্মোচিত হল অবশেষে। পুলিশকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যাওয়ার পর সে এখন কোথায়? ভবানী দেবী কে? অন্ধকার ডুয়ার্সের অভিনব কাহিনি অব্যাহত।

।।৭৯।।

রিসর্টের পেছনে ডায়না নদী। ওপারে অরণ্য। পাহাড়ের দিক থেকে ঘন মেঘ ক্রমশ আকাশ ছেয়ে ফেলছে। দুপুর থেকেই আবহাওয়া থম মেরে ছিল। বুদ্ধ ব্যানার্জি অনুমান করছিলেন যে, ঝড়বৃষ্টি হবে। এখন সেই অনুমান বাস্তবের দিকে দৌড়াচ্ছে দেখে বেশ তৃপ্ত মনে রিসর্টের বারান্দায় এসে বসলেন। কয়েক ঘণ্টা আগেই এখানে তিনি এসেছেন। আগামী কয়েক মাস তাঁকে প্রায়ই আসতে হবে ডুয়ার্সে। তাঁর বহু দিনের স্বপ্ন 'ব্ল্যাক বেঙ্গল' এবার গঠিত হওয়ার পথে। তাঁর খুব ইচ্ছে, এই পঁচিশে বৈশাখে কাজ শুরু করে দেবে তাঁর দল। কিন্তু তার আগে চাই দল গঠন। দাস, সুরেশ কুমার আর রঞ্জিত— এই তিনজনকে দলে আনতে পারলে ডুয়ার্স আর নর্থ-ইস্টে ক্যাভেন্ডিস কিচ্ছু করতে পারবে না। তার মানে দিল্লি হাই অকেজো হয়ে যাবে এদিকে। বুদ্ধ ব্যানার্জি অনুমান করছেন যে, আর কয়েক দিনের মধ্যেই দিল্লি হাই নিশ্চিত হয়ে যাবে যে, তিনি আর তাদের সঙ্গে নেই। এটা জানার পর তাদের প্রতিক্রিয়া কী হবে, সেটাও বিলক্ষণ জানেন বুদ্ধ ব্যানার্জি। বাংলা সমেত গোটা উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজত্ব হাতছাড়া হওয়ার টেনশনে জোর প্রতি আক্রমণ চালাতে চাইবে।

চাইলে দিল্লি হাই যে কোনও নাশকতা দেশের যে কোনও প্রান্তে যখন-তখন ঘটিয়ে দিতে পারে। এর জন্য জঙ্গিগোষ্ঠীদের সঙ্গে তাদের সুসম্পর্ক বজায় রাখা জরুরি। ডুয়ার্সে তারা পল অধিকারীকে পেয়ে যাবে বলে নিশ্চিন্ত ছিল। আসলে তারা বুদ্ধ ব্যানার্জির উপর দায়িত্ব দিয়ে নিশ্চিন্তে ছিল।

বুদ্ধ ব্যানার্জি কালো হয়ে আসা আকাশ আর ছায়াচ্ছন্ন বিকেলের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন। দিল্লি হাই-এর বাকিরা অনেক কিছুই এখনও জানেনি। 'ডার্ক ক্যালকাটা' নামক প্রতিদ্বন্দ্বীর অকস্মাৎ উত্থান সম্পর্কে তাদের কৌতূহলের অন্ত ছিল না। সেটা বুদ্ধ ব্যানার্জির তৈরি জেনে তারা কেমন অবাক হবে, সেটা ভেবেই হাসছিলেন তিনি। কিন্তু সুরেশ কুমারকে এবার জানাতে হবে যে, তিনি ব্ল্যাক বেঙ্গল তৈরি করেছেন। ডার্ক ক্যালকাটা এবার সে দলে মিশে যাবে এবং দিল্লি হাই থেকেও আসবে কেউ কেউ।

হাওয়ার বেগ বাড়ছে। বুদ্ধ ব্যানার্জি স্যাটেলাইট ফোন তুলে সুরেশ কুমারকে ধরলেন। সে তখন শিলিগুড়িতে একটা জরুরি আলোচনায় বসেছিল। ক্যাভেন্ডিসকে কীভাবে নিকেশ করা যায়, সে নিয়েই কথা হচ্ছিল তাদের মধ্যে। কিন্তু বিদঘুটে একটা নম্বর থেকে ফোন আসছে দেখে সে তক্ষুনি আলোচনা থামিয়ে পাশের ঘরে গিয়ে ধরল কলটা।

'বলুন দাদা!' সুরেশ কুমার বিনীত সুরে বলল।

'ক্যাভেন্ডিসকে ট্র্যাক করলে?' কৌতুকের সুরে বললেন বুদ্ধ ব্যানার্জি।

'একদম। একটা হোটেলে আছে এখানে। যে কোনও দিন অ্যাকশন হয়ে যাবে দাদা!'

'ক্যাভেন্ডিসও তা-ই ভাবছে।' ঝোড়ো বাতাস উপভোগ করতে করতে বললেন তিনি, 'তুমি তাকে ফলো করছ, সে তোমাকে ফলো করছে। ভেরি চাইল্ডিশ সুরেশ!'

'সরি দাদা!'

'কাজের কথা শোনো। আমি ডার্ক ক্যালকাটা তুলে দিচ্ছি। আমার ড্রিম প্রোজেক্ট ভাবছি নেক্সট পঁচিশে বৈশাখ লঞ্চ করব।'

'কী প্রোজেক্ট দাদা?' সুরেশ কুমারের গলা শুকিয়ে যায়।

'ব্ল্যাক বেঙ্গল। সেই দলে তুমি থাকবে, দাস থাকবে, রঞ্জিত থাকবে। তোমার সঙ্গে ব্লু ফিল্‌মে কাজ করা মেয়ে তিনটেও থাকবে।'

সুরেশ কুমার এসব শুনে বাক্য হারিয়ে ফেলে। তারপর নিজেকে সামলে বলে, 'আপনার লিডারশিপে কে না কাজ করতে চাইবে দাদা!'

'তাহলে আপাতত অফ হয়ে যাও। ক্যাভেন্ডিসকে মিসগাইড করতে থাকো। পঁচিশে বৈশাখের আগে তোমাকে ডেকে নেব।'

'সেটা কোন ডেট দাদা?' সুরেশ কুমার কিঞ্চিৎ বিভ্রান্তির সুরে জানতে চায়। কিন্তু বুদ্ধ ব্যানার্জি লাইন কেটে দিয়েছেন। রিসর্টে তার সামনে তখন বৃষ্টি পড়ছে। পাহাড়ের দিক থেকে জঙ্গল ভেদ করে ছুটে আসছে এলোমেলো কিন্তু জোরালো হাওয়া। তিনি মন দিয়ে প্রকৃতির অশান্ত চেহারা দেখতে লাগলেন।

শিলিগুড়িতেও তখন মেঘলা আকাশ। হোটেলের ঘরে বসে ক্যাভেন্ডিস চা খাচ্ছিলেন। সামনে খোলা ল্যাপটপ। কাপ হাতে ল্যাপটপের স্ক্রিনে ভেসে ওঠা বুদ্ধ ব্যানার্জির প্রোফাইলের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিলেন তিনি। তিনি যে একটা গেম খেলছেন, সে নিয়ে ক্যাভেন্ডিসের মনে আর কোনও সন্দেহ নেই। তাঁর গত কয়েক মাসের কাজে বিস্তর ভুল ধরা পড়েছে। বুদ্ধ ব্যানার্জির পক্ষে এই জাতীয় ভুল অসম্ভব।

ক্যাভেন্ডিস চায়ের কাপ শেষ করে সিদ্ধান্তে এলেন যে, মুম্বইতে হেড অফিসে গিয়ে কথা বলতে হবে।

৮০

সকাল এগারোটা নাগাদ টিভির খবরে কনক দত্ত হঠাৎ শুনলেন, কাশিয়াগুড়ির একটি এনজিও অফিসে পুলিশ হানা দিয়েছে। বুদ্ধ ব্যানার্জির ফোন পাওয়ার পর ক'দিন হল বেশ ঝিমাচ্ছিলেন তিনি। শ্যামলের মায়ের দিকে তাকাতে অস্বস্তি হচ্ছিল। শ্যামল যে আর বেঁচে নেই, সেটা পুলিশি অভিজ্ঞতায় আগেই টের পেয়েছিলেন তিনি। বুদ্ধ ব্যানার্জির ফোন সেটা নিশ্চিত করেছে সে দিন। কনক দত্ত বুঝে উঠতে পারছিলেন না যে, মৃত্যুসংবাদটা জানাবেন কি না। স্ত্রীকেও বলেননি তিনি।

কিন্তু টিভিতে খবরটা শুনে তিনি লাফিয়ে উঠলেন। পুলিশ হানা দিলেও পাখি আগেই উড়ে গেছে। এলাকার লোকেরা জানাচ্ছে, দু'দিন আগে অনেক রাত পর্যন্ত লোক আর গাড়ি ছিল কন্যাসাথির অফিসে। সম্ভবত সেই রাতেই ভেগে গিয়েছে তারা। তবে গত দু'দিন অফিসে তালা দেওয়া থাকলেও কেউ সন্দেহ করেনি। কারণ, কখনও কখনও এমন তালা তারা দেখেছে আগে। তবে তালা ভেঙে গুটিকয় আসবাব ছাড়া কিছুই পায়নি পুলিশ। গোটা অফিসে এক টুকরো কাগজও মেলেনি।

'তার মানে আগেই খবর পেয়েছিল যে রেইড হবে!' কনক দত্ত মনে মনে বললেন। টিভির সাংবাদিক জানাচ্ছেন যে, সন্ধের পর থেকে অনেক রাত পর্যন্ত স্থানীয় ক্লাবঘরে ছেলেরা আড্ডা দেয়। কিন্তু দু'দিন আগের সেই রাতে ক্লাবে কেউ আসেনি। সে দিন তারা থাকলে মালপত্র নিয়ে কন্যাসাথির লোকেরা পালিয়ে গেলে জানাজানি হয়ে যেত।

'ক্লাবটাকে অফ করে রাখা হয়েছিল সে দিন! আমি শিয়োর!' বিড়বিড় করে কথাগুলো বলে কনক দত্ত অস্থিরভাবে পায়চারি শুরু করে দিলেন। নবেন্দু মল্লিকের নাম বারবার তাঁর মাথায় এসে ঘুরপাক খেয়ে চলে কেন যাচ্ছে, সেটা বোঝার চেষ্টা করতে লাগলেন তিনি। একটু পরেই তাঁর মনে পড়ে গেল যে, ফালাকাটার এই যুবনেতাটির বাড়িতেই কন্যাসাথির অফিস ছিল। টিভির সাংবাদিকের বিবরণ অনুযায়ী, যারা শিডিউলড কাস্ট মেয়েদের নিয়ে সার্ভে এবং সহযোগিতা করার নামে মেয়ে পাচারের কাজ করত।

'তাহলে সে রাতে ক্লাব মেম্বারদের অফ করার ব্যাপারে কি নবেন্দু মল্লিকের হাত আছে?' নিজের প্রতি প্রশ্নটা ছুড়ে দিয়ে পায়চারি থামালেন কনক দত্ত। টিভিতে নবেন্দু মল্লিককেই দেখাচ্ছে এখন। সে জোর গলায় বলছে, 'আমি সরল বিশ্বাসে বাড়ি ভাড়া দিয়েছিলাম। এমন কাণ্ড ভাবতেই পারছি না। পুলিশ নিরপেক্ষ তদন্ত করুক।'

কনক দত্ত একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলেন। সাদা জামা পরেছেন নবেন্দু মল্লিক। বুকপকেটে সিগারেটের প্যাকেটের আভাস স্পষ্ট। ব্র্যান্ডটা চিনে ফেললেন তিনি। কন্যাসাথির ড্রাইভার যে সিগারেট খায় বলে জানিয়েছিল শুক্লা দাস। কিন্তু নিজের বাড়িতে তো যেতেই পারে নবেন্দু মল্লিক। সিগারেটও খেতে পারে।

এবার চেয়ারে গা এলিয়ে বসলেন কনক দত্ত। নবেন্দু মল্লিকের উপর সন্দেহটা যাচ্ছে না। সে কি তলায় তলায় মেয়ে পাচারের কাজে যুক্ত? পুলিশের কেউ তাকে কন্যাসাথির অফিসে রেইড করার খবর আগাম জানিয়ে দিয়েছিল? গোটা ঘটনার সঙ্গে বুদ্ধ ব্যানার্জি জড়িয়ে নেই তো?

চেয়ার ছেড়ে উঠে কনক দত্ত দ্রুত বাইরের বার হওয়ার জন্য তৈরি হয়ে নিলেন। কাশিয়াগুড়িতে এখনই যেতে পারলে কিছু সূত্র মিললেও মিলতে পারে। মিনিট পনেরো পরে দেখা গেল, গাড়ি চালিয়ে কনক দত্ত কাশিয়াগুড়ি মোড়ে চলে এসেছেন। কন্যাসাথির অফিসের সামনে পৌঁছে তিনি দেখলেন, পুলিশ বাড়িটাকে ঘিরে রেখেছে। চারপাশে কৌতূহলী জনতার ভিড়। সেখানে যোগেশকে পেয়ে গেলেন তিনি। স্থানীয় পুলিশের খোঁচড়। কন্যাসাথির অফিসে নজরদারি চালাবার জন্য তার সঙ্গে পরি ঘোষালের রেফারেন্স নিয়ে দেখা করেছিলেন তিনি। অবশ্য কাজটা তাকে দেওয়া হয়নি। যোগেশ সম্ভবত নিজের তাগিদে এখানে এসেছে।

'কিস্‌সু পায়নি স্যার!' কনক দত্তকে দেখতে পেয়ে যোগেশ এগিয়ে এসে পাশে দাঁড়িয়ে নিচু স্বরে বলল, 'রেইড করার খবর তো লিক হয়েইছে, লোকাল লোকের হেল্পও পেয়েছে ভেগে যাওয়ার সময়।'

'বাড়িটা তো নবেন্দু মল্লিকের, তা-ই না?' কনক দত্ত জিজ্ঞেস করলেন।

'ওটা স্যার খুব ঘাগু মাল! এখানে শুক্লা দাস বলে একটা মেয়ে ছিল। তার সঙ্গে গপ্প করতে মাঝে মাঝেই আসত। তবে গপ্প ছাড়া আর কিছু যে করত না, সেটা বলি কী করে!' একটু নিচু হয়ে জানাল যোগেশ, 'যদ্দূর খবর পাচ্ছি, তাতে ওই শুক্লা দাসই ছিল মেয়ে পাচারের লিডার।'

'শিয়োর?' কনক দত্তর ভুরু কুঁচকে গেল— 'নবেন্দু মল্লিক কি এদের সঙ্গে যুক্ত?'

'শুক্লা দাসের ব্যাপারটা স্যার শিয়োর। তবে নবেন্দু মল্লিক বোধহয় এদের লোক না।'

'ওরা রাতের বেলায় এত সহজে জিনিসপত্র নিয়ে ভেগে গেল কী করে? শুনলাম সামনের ক্লাবটা নাকি সে দিন খোলেইনি!'

যোগেশ মৃদু হেসে বলল, 'জট আছে স্যার। অনেক জট আছে। আপনার খবর লাগবে? তবে দিনকালের অবস্থা তো জানেনই। একটু ভাল চাল তিরিশের নিচে নেই। চাল কেনার টেনশন না থাকলে খবরের অভাব হবে না।'

বিনা বাক্যব্যয়ে কনক দত্ত একটা পাঁচশো টাকার নোট বার করে প্যান্টের পকেটে একটুখানি ঢুকিয়ে রাখলেন। যোগেশ

পলকের মধ্যে তুলে নিল সেটা। তারপর কৃতজ্ঞতার হাসি দিয়ে বলল, 'নিশ্চিন্ত থাকেন।'

৮১

জলপাইগুড়ি শহরের তিন নম্বর রেল গুমটির কাছে বাস থেকে নামল সিরাজুল। অনেকদিন পর ম্যাডামের সঙ্গে দেখা হবে। আজ সকালে ঘুম থেকে সিরাজুল উঠেছে ম্যাডামের ফোন আসার শব্দে। জলপাইগুড়িতে দেখা করার কথা বলেই ফোন কেটে দিয়েছিলেন তিনি। বাংলাদেশসহ এ দেশের উত্তর-পূর্বে মেয়ে পাচারের কাজে ম্যাডাম অতিশয় দক্ষ। বেশ কিছু এনজিও খুলে রেখেছেন তিনি মুখোশ হিসেবে। তার আড়ালে দিব্যি কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন তিনি। বয়স বেশি নয়। প্রথমবার সাক্ষাতের পর সিরাজুল বুঝতে পেরেছিল যে, ম্যাডাম অনেক দূর যাবেন।

জলপাইগুড়ি শহরে অনেক লোক ফ্ল্যাট কিনে রেখে দিয়েছেন পরে এসে থাকবেন বলে। সেই ফ্ল্যাটগুলো সহজেই ভাড়া পাওয়া যায়। দালালরাই ভাড়াটে জোগাড় করে আনে। ম্যাডাম তেমনই একটা ফ্ল্যাট তিন বছর হল ভাড়া করে রেখেছেন এই শহরে। সেখানেই যাচ্ছে এখন সিরাজুল। ইন্ডিয়ার সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক ভাল হলে সিরাজুলদের কিছু সমস্যা হয়। কাজকারবারে টান পড়ে। ফলে হাতে কিছু সময় থাকে। সিরাজুল সেই সময়টা অন্য কোনও কাজে ব্যবহার করার কথা ভাবছিল। ম্যাডামের সঙ্গে দেখা করে যদি ন্যাংটো ছবির নায়িকা জোগাড়ের টেন্ডার পাওয়া যায়, তবে খারাপ হবে না। মেয়ে পাচারের কাজ কিছুদিন ঢিমে তালে চলবে। বাংলাদেশের লোকেরা জানিয়ে দিয়েছে যে, ইন্ডিয়ার বদলে তারা কিছুদিন সরাসরি আরব দুনিয়ায় মেয়ে পাঠাবে। বাংলাদেশে ন্যাংটো ভিডিয়ো তৈরি করার কাজে ইদানীং অনেকে নেমে পড়েছে। প্রচুর প্রোডাকশন। খরচা বেশ কম। তাই সেখানে থেকে কাজ করার কথাও ভেবেছে সিরাজুল।

আবাসনের নীচতলায় একজন বয়স্ক সিকিয়োরিটি রেডিয়ো শুনছিল। সিরাজুল তাকে ফ্ল্যাটের নাম্বার বলতে সে নাম আর ফোন নাম্বার লিখে নিয়ে লিফ্‌টের দরজার দিকে ইঙ্গিত করে বলল, 'যান। ম্যাডাম আমাকে বলেও রেখেছেন।'

সিরাজুল ফ্ল্যাটের দরজায় এসে কলিং বেলের বোতাম টিপল। দরজা খুলে গেল। সিরাজুল দেখল সাধারণ চুড়িদার পরা ম্যাডাম দাঁড়িয়ে।

'আসেন।' ম্যাডাম একটু হেসে আমন্ত্রণ জানাল। ম্যাডামকে আমরা চিনি। এর নাম শুক্লা দাস। যদিও তার আসল নাম অজানা। তাই তাকে শুক্লা দাস বলেই ডাকব।

'ভাবিনি আপনার সঙ্গে এর মধ্যে দেখা হবে।' সিরাজুল প্রায় নিরাভরণ ড্রয়িং রুমে একটা চেয়ারে বসে বলল, 'চুপচাপ কাজকামের জন্য এই টাউনটা বেশ ভাল।'

'আমি দল চেঞ্জ করছি।' শুক্লা দাস বলল, 'কাগজে দেখেসেন নিশ্চয়ই? কন্যাসাথি এনজিও?'

ম্যাডামের সঙ্গে দেখা করে যদি ন্যাংটো ছবির নায়িকা জোগাড়ের টেন্ডার পাওয়া যায়, তবে খারাপ হবে না। মেয়ে পাচারের কাজ কিছুদিন ঢিমে তালে চলবে। বাংলাদেশের লোকেরা জানিয়ে দিয়েছে যে, ইন্ডিয়ার বদলে তারা কিছুদিন সরাসরি আরব দুনিয়ায় মেয়ে পাঠাবে। বাংলাদেশে ন্যাংটো ভিডিয়ো তৈরি করার কাজে ইদানীং অনেকে নেমে পড়েছে।

'আপনার স্কিম ছিল সেটা?' সিরাজুল একটু হাসে। খবরটা পড়েছে সে—'পুলিশের ধারণা, সে এনজিও-র আসল লিডারের নাম শুক্লা দাস। নামটা আগে শুনি নাই। সেটা কি আপনি?'

'এই নামে আমি ওখানে ফাইফরমাশ খাটতাম।'

'আচ্ছা বোকা বানাইসেন তাহলে!' সিরাজুল বেশ আমোদ পেয়ে হাসল— 'তা ম্যাডাম, পুলিশকে খবর দিল কে? আপনি দিল্লি হাই-এর হয়ে কাম করতেসিলেন। তাদের নেটওয়ার্ক তো মারাত্মক। বুদ্ধ ব্যানার্জি থাকতে পুলিশ রেইড করে কীভাবে?'

'পুলিশকে খবরটা বুদ্ধ ব্যানার্জিই দিয়েছে।' সিরাজুলকে অবাক করে দিয়ে জানায় শুক্লা দাস। তারপর তার অবাক হওয়ার মাত্রাটা দ্বিগুণ করে দিয়ে বলে, 'বুদ্ধ ব্যানার্জি দিল্লির দল ছাইরে দিসে। সে নতুন দল বানাইসে। নাম ব্ল্যাক বেঙ্গল। আমি তার নতুন দলে যোগ দিসি।'

ঘোর কাটতে একটু সময় লাগল সিরাজুলের। তারপর সে উত্তেজিত গলায় বলল, 'আমারে একটা চান্স দ্যান ম্যাডাম নয়া দলে। এদ্দিন তো ফিরিলান্সার হয়া কাম করলাম। এইবার নিয়ে ন্যান আমায়।'

'তার আগে একটা কাজ করতে হবে সিরাজুল!' শুক্লা দাস শ্রোতার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমরা লাস্ট যে মেয়েটারে তুলসি, সে এই টাউনেই আছে। মেয়েটারে এখনই বাইরে পাঠানো যাবে না। তুমি লোক দাও। মেয়েটারে কোথাও আটকায়ে রাখুক। কথা না শুনলে বলে দিবা রেপ কইরে লাশ ফ্যালায় দিতে।' কঠিন সুরে বলল শুক্লা দাস। এখন তার চেহারা দেখলে শত উত্থান তেল মেখেও শক্তি অর্জন করতে পারতেন না নবেন্দু মল্লিক।

সিরাজুল অবশ্য কথাটা স্বাভাবিকভাবেই গ্রহণ করল। টোপ দিয়ে মেয়েদের একবার ধরতে পারলে তাদের আর ছেড়ে দেওয়ার নিয়ম নেই। সিরাজুলের মনে পড়ল ভবানী দেবীর কথা। তিনি তান্ত্রিক এবং জ্যোতিষ। পাশাপাশি বাগে না আসা মেয়েদের শায়েস্তা করতে তাঁর জুড়ি নেই। ডুয়ার্সের প্রশাসনের অনেকেই ভবানী দেবীর ভক্ত। তিনি যোগ্য পুরুষদের ভাগ্য পরিবর্তনের মন্ত্র এবং স্বাদ পরিবর্তনের জন্য নারী সরবরাহ করেন।

'কোথাকার মাইয়া?' সিরাজুল এবার সহজ সুরে জানতে চায়।

'আলিপুরদুয়ারের এক মাস্টারের ফ্যামিলিতে মানুষ। চা-বাগানের মেয়ে। নাম রুপালি মুন্ডা।'

'স্বাস্থ্য কেমন?'

'কাজ করতে রাজি থাকলে ভালই রোজগার করবে। বয়স কম। এখনও পুরুষের সঙ্গে শোয়নি।

'টেনশন নিতে হবে না আপনারে। আমি ব্যবস্থা নিব। তা আপনে কি এখন টাউনেই থাকবেন ম্যাডাম?'

শুক্লা দাস কোনও জবাব না দিয়ে রহস্যময়ীর মতো হাসল। সিরাজুল ব্ল্যাক বেঙ্গল-এর হয়ে কাজ করতে চাইছে। তাকে দলে নেওয়ার ব্যাপারে বুদ্ধ ব্যানার্জির আগ্রহ আছে। পাশাপাশি এটাও ভাবতে হবে যে, সিরাজুলকে ক্যাভেন্ডিসও টোপ দিতে পারে। বুদ্ধ ব্যানার্জির পিছনে তাঁর রাজনৈতিক দলের একজন শক্তিশালী নেতা উঠে-পড়ে লেগেছেন। তাঁকে বোকা বানাবার উদ্দেশ্যে কন্যাসাথি রেইড করার জন্য পুলিশকে বকলমে বুদ্ধ ব্যানার্জিই তথ্য জুগিয়েছিলেন। কিন্তু সিরাজুলকে এত কথা বলা যাবে না। বিজু প্রসাদ মারা যাওয়ার পর শুক্লা দাস সরাসরি বুদ্ধ ব্যানার্জির নির্দেশেই চলেছে। কন্যাসাথি গুটিয়ে যাওয়ার পর তাকে বলে দেওয়া হয়েছে যে, দাসবাবু যোগাযোগ না-করা পর্যন্ত চুপচাপ বসে থাকতে। তাই এখন কিছুদিন জলপাইগুড়িতেই থাকবে শুক্লা দাস।

সিরাজুল বিদায় নিল।

(ক্রমশ)

জলপাইগুড়িতে আবৃত্তি বিষয়ক কর্মশালা

তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার আয়োজিত জলপাইগুড়ি বিভাগের আবৃত্তি বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হল গত ৭ থেকে ৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৭। তিন দিনব্যাপী এই কর্মশালা চলেছে জলপাইগুড়ি ডিআরডিসি হলে।

প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে এই কর্মশালার শুভসূচনা হয়। প্রদীপ প্রজ্বলন করেন সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক জগদীশ রায়, জেলার বিশিষ্ট আবৃত্তিশিল্পী আকাশ পালচৌধুরী প্রমুখ।

মোট ৩০ জন শিক্ষার্থী এই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। প্রথম এবং দ্বিতীয় দিনের প্রথমার্ধে সতীনাথ মুখোপাধ্যায় আবৃত্তিশিল্পের বিভিন্ন দিক (উচ্চারণ, কণ্ঠস্বরচর্চা, শ্রুতিনাটক) নিয়ে শিক্ষার্থীদের আলোকপাত করেন।

দ্বিতীয় দিনের দ্বিতীয়ার্ধে প্রশিক্ষকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন প্রণতি ঠাকুর। তিনিও বিস্তারিতভাবে আবৃত্তিচর্চার পদ্ধতি, মাইক্রোফোন ব্যবহার, উচ্চারণ, বোধ, ছন্দ

সতীনাথ মুখোপাধ্যায়

ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। দু'দিনেই শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিপুল উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়, এবং প্রতি বছরই এইরকম কর্মশালা আয়োজনের দাবি ওঠে। শিবির শেষে শিক্ষার্থীদের শংসাপত্র বিতরণ করা হয়।

সীমা সান্যাল চৌধুরী

দিনহাটায় পঞ্চম বর্ষ হিতেন নাগ স্মৃতি আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলন

উদ্‌বোধন করছেন ডঃ বারিদবরণ ঘোষ, ছবি: হরিপদ রায়

দিনহাটায় হয়ে গেল 'পঞ্চম বর্ষ হিতেন নাগ স্মৃতি আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলন ২০১৭'। কার্যতই এই সাহিত্য সম্মেলন আন্তর্জাতিক রূপ নেয়। এ দেশের বিভিন্ন রাজ্যের কবি-সাহিত্যিকরা ছাড়াও সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন প্রতিবেশী বাংলাদেশ, ভুটান ও নেপালের কবি-সাহিত্যিকরা। দু'দিনের এই আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলনের উদ্‌বোধন করেন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি ডঃ বারিদবরণ ঘোষ। উপস্থিত ছিলেন ভুটানের বিশিষ্ট কবি এইচ বি বিশ্ব, লোকনাথ প্রধান, বাংলাদেশের কবি রুকসানা জাখান সানু, কবি সরোজ দেব, নেপালের প্রখ্যাত কবি দুর্গা রাই, বিহারের কবি বিদ্যুৎ পাল, বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক-লেখক ডঃ আনন্দগোপাল ঘোষ প্রমুখ।

দিনহাটা বয়েজ রিক্রিয়েশন ক্লাব আয়োজিত এই আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলনের উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠানে রক্তব্য রাখতে গিয়ে ডঃ বারিদবরণ ঘোষ বলেন, বাংলা গদ্যসাহিত্যের প্রথম নিদর্শন এই কোচবিহার। ১৫৫৫ সালে কোচবিহার মহারাজা আসাম মহারাজাকে যে পত্র লিখেছিলেন, সেটিই বাংলা গদ্যের প্রথম নিদর্শন। অথচ নিম্নবঙ্গীয় মানুষরা উত্তরবঙ্গের সাহিত্যচর্চাকে তেমন মর্যাদা দেয়নি। তাই তো নিম্নবঙ্গকে বাদ দিয়েই উত্তরবঙ্গে সাহিত্যচর্চা শুরু হয়েছে।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের প্রখ্যাত কবি রুকসানা জাখান সানু বলেন, কবি-সাহিত্যিকরা সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে। দিনহাটায় যে আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলন হচ্ছে, এতে বিভিন্ন দেশের কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে একটা ভাবের আদান-প্রদান হচ্ছে।

সাহিত্য সম্মেলনের অমিয়ভূষণ মজুমদার নামাঙ্কিত মঞ্চে 'সাহিত্যে আঞ্চলিকতা আন্তর্জাতিকতার পরিপন্থী বা পরিপূরক' বিষয়ক এক আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনায় অংশ নেন অধ্যাপক বিকাশ রায়, সুনীল চন্দ ও শ্যামল চৌধুরী। দীনেশচন্দ্র সেন নামাঙ্কিত মঞ্চে 'ভারতের ঐক্য ও সংহতির প্রশ্নে সাহিত্যের ভূমিকা' বিষয়ক এক আলোচনাসভায় আলোচক ছিলেন ডঃ স্বপনকুমার মণ্ডল, ডঃ রমাপ্রসাদ নাগ, আসামের সাহিত্যিক গোপালচন্দ্র বেজ বড়ুয়া, দিলীপ চক্রবর্তী প্রমুখ। 'বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে বাংলা সাহিত্যের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ' বিষয়ক এক আলোচনাসভায় বর্তমান বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি ভবিষ্যতের নানা বিষয়ের ইঙ্গিত দেন অমর চক্রবর্তী, সুনন্দা গোস্বামী, সঞ্চিতা দাস প্রমুখ। এ ছাড়াও শিশুসাহিত্য বিষয়ক আলোচনা ছাড়াও 'গল্প বলার আসর', 'কবিতাপাঠের আসর' এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

হরিপদ রায়

বাঁ দিকে আলোচনায় পরিমল দে, ডান দিকে রাভা সংগীত পরিবেশন করছেন জ্যোৎস্না রাভা।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

আলিপুরদুয়ারের 'লৌকিক' ও 'কাণ্ডারী' পত্রিকার উদ্যোগে আলিপুরদুয়ারের একটি বেসরকারি ভবনে পালিত হল আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। প্রিয়া মজুমদারের সংগীতের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। স্বাগত ভাষণ দেন এই দু'টি সংস্থার আহ্বায়ক প্রসেনজিৎ দাস। অনুষ্ঠান মঞ্চে উপস্থিত থেকে মাতৃভাষা দিবসের উপর আলোচনায় অংশ নেন— পরিমল দে, তমোনাশ দে সরকার, রঞ্জিত মালাকার, নির্মলকুমার ভট্টাচার্য, প্রমোদ নাথ, অর্ণব সেন-সহ ডুয়ার্সের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীরা। এর পর 'লৌকিক' ও 'কাণ্ডারী'র সাহিত্য পত্রিকা 'প্রান্তজনের সখা'র ৪র্থ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি প্রকাশ করেন ডুয়ার্সের বিশিষ্ট সাহিত্যিক-অধ্যাপক অর্ণব সেন।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে শুরু হয় ডুয়ার্সের বিভিন্ন জনজাতির ভাষাভাষীদের নিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। রাভা ভাষায় সংগীত পরিবেশন করেন জ্যোৎস্না রাভা। বোড়ো ভাষায় আবৃত্তি পরিবেশন করেন নির্মলা কাজী। রাজবংশী ভাষায় কবিতা পাঠ করেন রামেশ্বর রায়। এ ছাড়াও সংগীত ও আবৃত্তিতে অংশ নেন অধ্যাপক সুদীপ্ত মাঝি, প্রতীপ ঘটক, মনোজিৎ দে, সবিতা সরকার, স্বপন ভৌমিক, গায়ত্রী দেবনাথ। ডুয়ার্সের বিশিষ্ট চা-গবেষক রাম অবতার শর্মা হিন্দি কবিতা পাঠ করে দর্শকের মন জয় করে নেন।

সব শেষে ডুয়ার্সের বিশিষ্ট লোকসংস্কৃতি গবেষক প্রমোদ নাথকে সম্মাননা জ্ঞাপন করা হয় 'লৌকিক' ও 'কাণ্ডারী' পত্রিকার পক্ষ থেকে।

২১ ফেব্রুয়ারি এই অনুষ্ঠানের দিন সভাকক্ষ কানায় কানায় ভরে যায়। এই ঘটনা আয়োজকদের মধ্যে ঊর্মি রায়, রাজীব ঘোষ, প্রিয়া মজুমদারদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল বলে দাবি করেন আহ্বায়ক প্রসেনজিৎ দাস। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুন্দরভাবে সঞ্চালনা করেন গোরাচাঁদ চট্টোপাধ্যায়।

২১শে স্মরণ

ডুয়ার্স জুড়ে পালিত হল আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। ২১শে স্মরণ করল কোচবিহারও। কোচবিহার তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর এবং রাজবংশী ভাষা আকাদেমির যৌথ উদ্যোগে পালিত হল এই দিনটি। ২১ ফেব্রুয়ারির দুপুরে সাগরদিঘির পাড়ে অবস্থিত ভিক্টর প্যালেসের একটি কক্ষে তারা একটি সুন্দর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানের শুরুতে বাংলা ভাষার জন্য যাঁরা প্রাণ দিয়েছেন, সেইসব শহিদের উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন সাংসদ বিজয়চন্দ্র বর্মন। অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেন বাপি সূত্রধর, অপর্ণা ঘোষ ভট্টাচার্য প্রমুখ। বিশিষ্ট বাচিক শিল্পী চায়না চট্টোপাধ্যায়ের আবৃত্তি উপস্থিত সকলকে মুগ্ধ করে। আজকের যুগে প্রত্যেকের মাতৃভাষা হারিয়ে যেতে বসেছে। এই প্রসঙ্গে এ দিন সভায় উত্তরের ভাষাসংকট নিয়ে আলোচনা করেন অধ্যাপক ড. অলোককুমার সাহা। এ ছাড়াও কোচবিহার রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার, ইন্দ্রায়ুধ নাট্যগোষ্ঠীসহ নানা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে এই দিনটি পালন করা হয়।

নিজস্ব প্রতিনিধি

অন্তর্বঙ্গ নাট্য উৎসব মাতিয়ে দিল নাটক 'সাকিন'

গত ১৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ২১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ ও পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমির উদ্যোগে জঙ্গিপুর রবীন্দ্রভবন মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল অন্তরঙ্গ নাট্য উৎসব। মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গিপুরে রঘুনাথগঞ্জ শহরের নাট্যরসিক মানুষরা উপভোগ করলেন সাতটি ছোট এবং বড় দৈর্ঘ্যের জমজমাট নাটক। অন্তর্বঙ্গ নাট্য উৎসবে অংশগ্রহণ করে— শব্দমুগ্ধ নাট্যকেন্দ্র (দমদম), ইলোরা নাট্যদল (বীরভূম), অনুদর্শী (বেহালা), স্বপ্ন অঙ্গন (বর্ধমান), বর্ণনা (কোচবিহার), গণকৃষ্টি (কলকাতা) এবং আলিপুরদুয়ার থিয়েটার ডুয়ার্স। অন্তর্বঙ্গ নাট্য উৎসবে গত ১৮ ফেব্রুয়ারি আলিপুরদুয়ার থিয়েটার ডুয়ার্স মাতিয়ে দিল তাদের অনবদ্য প্রযোজনা 'সাকিন' নাটকটি দিয়ে। 'সাকিন' নাটকটি নির্দেশনায় মুনশিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন সিন্টু দত্ত। বলিষ্ঠ গল্পের নাট্যরূপ দিয়েছেন তিমিরবরণ রায়। এপার ও ওপার বাংলার দুই লোকশিল্পীর জীবন কাহিনি নিয়ে গড়া নাটক 'সাকিন'। সীমান্তপারে আশ্রিত বাবাজি ওরফে কৃষ্ণ এবং বাংলাদেশের বীণা ওরফে ফতেমার জীবনের করুণ কাহিনি এই নাটকের মূল উপজীব্য। তিলুর বাড়িতে আশ্রয় নেওয়া বীণা ওরফে ফতেমা হিন্দু না মুসলিম— এই বিতর্কের মধ্যেই দানা বাঁধে নারী পাচারকারীদের কুদৃষ্টি, সংস্কার ও কুসংস্কারের লড়াই এবং দুই দেশের সীমান্তপারের দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসারদের দোষারোপের পালা। কিন্তু শেষ সার্থক হয় লালন ফকিরের সেই গানটি— 'ও মিলন হবে কত দিনে... মনের মানুষের সনে'। নাটকটি দেখার পর উপস্থিত দর্শকমণ্ডলী ভীষণভাবে আপ্লুত হয়ে পড়েন এবং করতালি দিয়ে অভিনন্দন জানান। নাটক শেষ হওয়ার পর স্থানীয় নাট্যশিল্পীরা সাজঘরে এবং মঞ্চে উঠে 'সাকিন' নাটকের প্রত্যেক কুশীলবের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। মঞ্চে দাপিয়ে অভিনয় করেন— বাবাজি (গৌতম দত্ত), মেয়েটি (তনুশ্রী সাহা), তিলু (মিন্টু দত্ত), জ্যামনী (শাশ্বতী দত্ত), গোষ্ঠ (রিকু সাহা), সহযোগী (জগন্নাথ মোহন্ত), ডাক্তার (দেবাশিস সরকার), ক্যাপ্টেন সিং (নিবারণ রায়), জিন্দাল (ঋতব্রত সাহা), আবদুল (সুদীপ্ত মুখোপাধ্যায়) এবং গিয়াসউদ্দিন (পরিতোষ সাহা)। আলোকসম্পাতে সুজিত সাহা ও আশিস দে, আবহে শমিত সেন ও বিরাজ বণিক, নেপথ্য কণ্ঠশিল্পী শুভ সাহা, রূপসজ্জায় যতু সরকার, মঞ্চ পরিকল্পনায় তনয় সাহা, মঞ্চরূপায়ণে নিবারণ রায় ও দেবাশিস সরকার এবং পোশাকে অতনু ভট্টাচার্য। নাটকের শেষে নির্দেশক মিন্টু দত্ত উপস্থিত দর্শকমণ্ডলীর উদ্দেশে কিছু বক্তব্য রাখেন এবং অভিনন্দন জানান। নির্দেশকের হাতে নাট্য উৎসবের স্মারক, পুষ্পস্তবক ও উত্তরীয় প্রদান করেন জঙ্গিপুর পৌরসভার পুরপতি মাননীয় মুজাহারুল ইসলাম এবং রঘুনাথগঞ্জ ১ নং ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক মাননীয় অর্ণবপ্রসাদ মান্না। নাট্যসংস্থার সম্পাদক তনুশ্রী সাহা বলেন, আজকের উপস্থিত দর্শক 'সাকিন' নাটক দেখে যে উচ্ছ্বাস ও প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন তা সংস্থার কুশীলবদের নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের ফল।

নিজস্ব প্রতিনিধি

চিত্রকলা প্রদর্শনী

কোচবিহারে প্রদর্শিত হল চিত্রশিল্পী শ্রীহরি দত্তর একক চিত্র প্রদর্শনী। হোটেল যুবরাজের কনফারেন্স রুমে তিন দিন ধরে চলা প্রদর্শনীর উদ্‌বোধন করেন সাংসদ পার্থপ্রতিম রায়। ৩১টি ছবি নিয়ে প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছে মূলত শিল্পীর ডুয়ার্স ভাবনা। সেখানে যেমন স্থান পেয়েছে প্রকৃতি, তেমনি মানুষও। জলরঙের ব্যবহারে শিল্পী একের পর এক ক্যানভাসে ফুটিয়ে তুলেছেন প্রকৃতি, নদী, নিস্তব্ধতাকে। সমকালীন সমস্যাও তাঁর তুলিতে উঠে এসেছে। কীভাবে কোচবিহারে বোরোলি মাছ হারিয়ে যেতে বসেছে নদী থেকে তা-ও দেখিয়েছেন তাঁর শিল্পের মাধ্যমে। শিল্পীর আক্ষেপ, আজ পর্যন্ত কোচবিহারে একটাও আর্ট গ্যালারি তৈরি হল না।

নিজস্ব প্রতিনিধি

বই পত্রের ডুয়ার্স

পর্যটকের জন্য

সম্প্রতি 'এখন ডুয়ার্স' প্রকাশনার দুটো বই হাতে এল। একটা কোচবিহার নিয়ে। নাম 'কোচবিহার'। দ্বিতীয়টি ডুয়ার্স বিষয়ক। এর নাম 'অভিনব ডুয়ার্সে'। শেষোক্ত বইটি অবশ্য এই নিয়ে কয়েকবার ছাপা হল। প্রথমটি বেরিয়েছিল কোচবিহার বইমেলায়। খবর পাওয়া গিয়েছে যে, সে বই বইমেলায় ভেটাগুড়ির জিলিপির মতো বিকিয়েছে।

রাজবাড়ি আর মদনমোহন মন্দিরের বাইরেও কোচবিহারের অনেক কিছু আছে। সেসব বাদ দিয়ে কোচবিহার অসম্পূর্ণ। কিন্তু রাজাদের ইতিহাস নিয়ে বিস্তর গ্রন্থ রচিত হলেও এক মলাটের মধ্যে কোচবিহারকে সামগ্রিকভাবে ধরে ফেলার মতো গ্রন্থ ছিল না একটাও। সাধারণ পাঠকের জন্য ছবি আর লেখায় সাজানো একটি সহজ সংকলনের খোঁজ পাঠক করেন না তা নয়। তবুও বই ছিল না তেমন। তাই প্রকাশক ভূমিকায় লিখেছেন, 'বইটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তৈরি করার চেষ্টা হয়েছে উৎসাহী সাধারণ পাঠক-পর্যটকের জন্য, পণ্ডিতম্মন্য গবেষকদের জন্য একেবারেই নয়।'

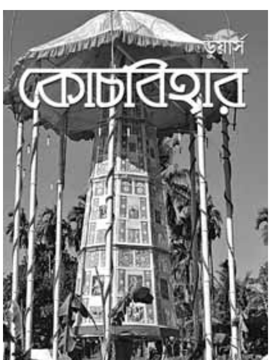

দু'শো পাতার রঙিন বইটি কোচবিহার নিয়ে সাধারণ পাঠকের সাধারণ চাহিদা যে পূরণ করবে, তা বলাই বাহুল্য। সংক্ষেপে কোচবিহারের রাজা-রানি-মন্দির-নদী-চাষ-সংস্কৃতি-ক্রীড়া- মিউজিয়াম-মেলা-প্রশাসন ইত্যাদি বর্ণিত হয়েছে সরল-সাবলীল ভাষায়। বিষয়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ছাপা হয়েছে প্রচুর রঙিন ফোটো। গোটা বিষয়টি সহসম্পাদিকা তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস বেশ কৃতিত্বের সঙ্গেই সামলেছেন বলে সাধারণ কোচবিহারবাসীর কাছে রোজকার চেনা জায়গাটা হঠাৎ একাধিক মাত্রা পেয়ে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তেরোটি রচনা আছে বইটিতে। কৃষি বিষয়ক রচনাটি পড়ার পর মনে পড়ল, তা-ই তো! কোচবিহারের কৃষিও তো বেশ উন্নত। আরেকটি রচনা মনে করিয়ে দিল, রেল মিউজিয়াম বলে একটা ভাল জিনিসও আছে সে শহরে। রাজাদের নিয়ে ছোট রচনাটি বেশ কাজের। সঙ্গে রাজপরিবারের বংশলতিকাটি থাকায় আরও সুবিধে।

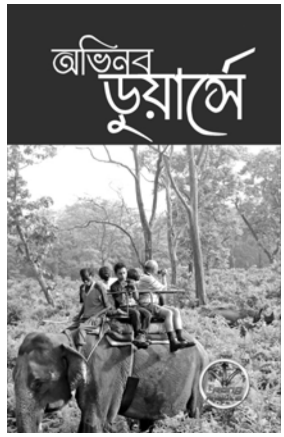

ভাল কাগজে ছাপা এবং চমৎকার বাঁধাই হওয়ায় বইটি দেখতেও ভাল হয়েছে। দ্বিতীয় সংস্করণে নিশ্চয়ই আরও কিছু যুক্ত হবে। যাঁরা ফোটো দিয়ে সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের চেষ্টা সফল। ফোটোগুলি বইটির অন্যতম সম্পদ।

'অভিনব ডুয়ার্সে'র পরিকল্পনা করা হয়েছে মূলত পর্যটকদের কথা মাথায় রেখে। বইটি প্রথম বেরিয়েছিল ২০১০ সালে। এবার পঞ্চম মুদ্রণ বার হল। অনেক সংযোজন হয়েছে এই মুদ্রণে। দু'শো পাতার রঙিন ছবিতে ভরপুর বইটিকে আটটি অধ্যায়ে ভাগ করে প্রতি ভাগে একাধিক রচনা রাখা হয়েছে। ডুয়ার্সে নানা অংশে ভাগ করে আলোচনা করার জন্যই এই কৌশল। রচনাগুলি কেবল পর্যটনকেন্দ্রের রাস্তা আর সৌন্দর্যের ছবি তুলে ধরে থেমে থাকেনি। বাড়তি আরও কিছু দিয়েছে, এবং সেই কারণেই আর পাঁচটা বইয়ের থেকে এই বইটা আলাদা। যাঁরা লিখেছেন, প্রত্যেকেই ডুয়ার্সকে ভারী সুন্দরভাবে চেনেন। বেশ কয়েকটি লেখা সব রকমের পাঠকের খুব কাজে আসবে। আলাদাভাবে রাসমেলা আর জল্পেশ নিয়ে দুটো রচনা স্থান পেয়েছে।

বহিরাগত পর্যটক তো বটেই, ঘরোয়া পর্যটকদেরও খুব কাজে লাগবে 'অভিনব ডুয়ার্সে'। লেখকরা অনেকটা গল্পের ছলে তাঁদের নিয়ে যাবেন এক ধরনের মানসভ্রমণে। অন্য দিকে বেশ কিছু প্রাসঙ্গিক বিষয় জেনে যাওয়ার কারণে ভ্রমণ পরিকল্পনা সেরে নিতেও সুবিধে হবে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যোগাযোগের সূত্র উল্লেখ করা হয়েছে। নতুন এই সংস্করণে যুক্ত হয়েছে সেইসব স্থান, যা সম্প্রতি টুরিস্ট স্পট হিসেবে সেজে উঠেছে। সাফারির সময় ও খরচের তালিকা আছে গোরুমারা অরণ্যের। এটা বেশ কাজে লাগবে।

বইটিতে ব্যবহৃত ছবিগুলি পাঠকের কাছে আদর পাবে। প্রচুর রঙিন ফোটোর পাশাপাশি বেশ কিছু সাদা-কালো ফোটোও আছে। ডুয়ার্সের প্রকৃতি, পর্যটন, জনজাতি, সংস্কৃতি ইত্যাদি হরেক বৈশিষ্ট্য খুব সহজে অনুভব করতে পারবেন পাঠক ফোটোগুলির কারণে। পর্যটকদের কাছে প্রিয় হয়ে ওঠার কারণে ডুয়ার্স ভ্রমণ নিয়ে বই-পুস্তকের অভাব নেই ঠিকই, কিন্তু এই বইটির মতো স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং পরিকল্পিত বই আর একটা নেই। দক্ষ গাইডের লেখা ডুয়ার্সের ভ্রমণ কাহিনির অনায়াস বিকল্প হতে পারে এই বই। জঙ্গল-জন্তু-পাহাড়ের বাইরেও ডুয়ার্সে আরও অনেক কিছু আছে, যা কিনা বাংলারই অঙ্গ, অথচ স্বতন্ত্র। বইটিতে এইদিকের হদিশও পাবেন পাঠক। এর ফলে তাঁর ডুয়ার্স ভ্রমণের অভিজ্ঞতা আরও ঋদ্ধ হবে।

বইটির পূর্ববর্তী সংস্করণ যেভাবে ফুরিয়েছে, তা থেকে বোঝা যায় যে, বর্তমান পরিবর্ধিত এবং উৎকৃষ্ট সংস্করণটিও ভ্রমণেচ্ছুক পাঠকের কাছে আদরণীয় হবে। যাঁর ডুয়ার্সের বাসিন্দা, তাঁদেরও যে বইটি বিশেষ পছন্দ হয়েছে, তা স্থানীয় বইমেলাগুলিতেই টের পেয়েছেন প্রকাশক। তবে, সম্প্রতি ডুয়ার্সের অরণ্যে বাঘের উপস্থিতির অকাট্য প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। ব্যাঘ্র পর্যটনের শুরুয়াতও হয়ে গিয়েছে শিলিগুড়ির কাছে। বেশ কিছু বাঘ ছাড়া হচ্ছে। পরবর্তী সংস্করণে নিশ্চয়ই এই বিষয়ে জমকালো আপডেট থাকবে বইটিতে।

কোচবিহার। সম্পাদনা- প্রদোষ রঞ্জন সাহা। এখন ডুয়ার্স। জলপাইগুড়ি। ২০০ টাকা।

অভিনব ডুয়ার্সে। সম্পাদনা- প্রদোষ রঞ্জন সাহা। এখন ডুয়ার্স। জলপাইগুড়ি। ২০০ টাকা।

নিজস্ব প্রতিনিধি

পুনশ্চ- এই বিভাগে আলোচনার জন্য উত্তরবঙ্গের লেখকদের বই-পত্রপত্রিকা প্রাধান্য পায়। পত্রিকার জলপাইগুড়ির ঠিকানায় এক কপি পাঠিয়ে দিলেই হবে। তবে কোনও কোনও ক্ষেত্রে আলোচনা প্রকাশে দেরি হতে পারে। কোনও পত্রিকার একাধিক সংখ্যা পাঠালে সর্বশেষ সংখ্যা নিয়েই আলোচনা হবে। আলোচনার জন্য পাঠানো বই-পত্রিকায় 'এখন ডুয়ার্সে আলোচনার জন্য' লিখে দেওয়া বাধ্যতামূলক। সঙ্গে সই ও তারিখ। ডুয়ার্স এবং উত্তরের বই-পত্রিকার সংবাদ নিয়মিত পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়াই এই বিভাগের একমাত্র উদ্দেশ্য।

ঘাসফুল আর কাস্তে-হাতুড়ির ভালবাসার অসম্ভব কাহিনি

আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সৌরভ চক্রবর্তী নিজের জেলার পাশাপাশি জলপাইগুড়ি জেলারও সভাপতি। কিন্তু জলপাইগুড়িকে সামলানোর দায়িত্ব তিনি দিয়েছেন দুলাল দেবনাথের হাতে। অতি বিশ্বস্ত সৈনিকের মতো সে দায়িত্ব সামলাচ্ছেন দুলালবাবু। কিন্তু এই কাহিনি 'রাজনৈতিক' নয়। রাজনীতি তো জীবনের একটা অঙ্গমাত্র। জীবনের চাইতে বড় কিছু হয় না। এই কাহিনিটা তাই জীবনের।

দুলালবাবু হিন্দু। আর দশটা রক্ষণশীল পরিবারের মতোই তাঁর পরিবার। তবুও রেজিনা বেগমকে বিয়ে করে ফেলেছিলেন তিনি। ঘটনাটা পরিবার এবং সমাজ— কেউই মন থেকে মানতে পারেনি তখন। সে এক কঠিন, অন্দরের লড়াই। তারপর সময় বয়ে গিয়েছে। দুলালবাবু এখন শ্বশুরবাড়ির প্রিয় জামাই। তাঁর বাড়িতে পারিবারিক বাসন্তী পুজো এবং ইদ পালনে কেউ কোনও সমস্যা খুঁজে পান না। রেজিনাবউদি উভয় ক্ষেত্রেই উপোস করেন।

যৌবনে দুলালবাবুর এক প্রবল প্রতিপক্ষের নাম এবার বলা দরকার।

তিস্তা ক্যানেল নিয়ে আন্দোলন, চা-বাগান নিয়ে আন্দোলন, পঞ্চায়েত দখলের যুদ্ধ— এমন হরেক রাজনৈতিক লড়াইতে দুলালবাবুকে চিরকাল বেগ দিয়েছেন সিপিএম-এর সমিজুদ্দিন মহম্মদ। সে লড়াই এখনও অব্যাহত। সমিজুদ্দিন মহম্মদ দলের শুভদিনে ডাকসাইটে নেতা ছিলেন। দলের খারাপ সময়েও তিনি শিবির বদলাননি। দুলালবাবুও ডানপন্থী রাজনীতি থেকে সরে যাননি। তাই পারস্পরিক তীব্র রাজনৈতিক লড়াই জারিই ছিল।

এই অবস্থায় সাধারণত যেটা হয় তা হল, দু'জনের মুখ দেখাদেখিই বন্ধ। বড়জোর সৌজন্যর খাতিরে দেখা হলে দুটো কথা বা একটু হাসি। স্রেফ রাজনৈতিক মতভেদের কারণে দু'জন বাঙালি একে অপরকে সহ্য করতে পারছে না— এটাই এখন সাধারণ নিয়ম হয়ে গিয়েছে। কিন্তু যাঁরা প্রকৃত রাজনীতিবিদ, তাঁরা কখনও জীবনকে রাজনীতির ঊর্ধ্বে রাখেন না। দলগত ক্ষেত্রে সবসময় না পেরে উঠলেও ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে জীবনকে আর পাঁচটা সাধারণ মানুষের মতোই দেখেন।

এইভাবে জীবনকে দেখাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু কালে কালে জীবনের 'স্বাভাবিক' বিষয়গুলিই বিরল হয়ে যাচ্ছে।

এই অবস্থায় 'কহানি মে টুইস্ট'। কিন্তু কাহিনি নয়। বাস্তব। দুলালবাবুর পুত্র রাহুল আর সমিজুদ্দিনবাবুর কন্যা মেহনাজ প্রকৃতির নিয়মে পরস্পরের চোখে হারাতে শুরু করলেন। অতঃপর আবার বড় হয়ে উঠল 'জীবন'। গান্ধি আর মার্কস মধুর হেসে আড়ালে চলে গেলেন। এই তো সে দিন ধুমধাম করে 'বেয়াই' হলেন দুই চিরকালের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ। এটা শুনে যাঁরা বলছেন, রাজনীতিতে সব সম্ভব— তাঁদের মনে রাখতে হবে যে, জীবনেও সব সম্ভব।

সাত-সাতবার হজ করে আসা নুরুল ইসলামের মতো ব্যক্তি জোর গলায় বলেন, 'দুলাল খুব ভাল ছেলে।'

তা, রাহুল-মেহনাজের বিয়ে সম্প্রতি জলপাইগুড়ি শহরে খানিকটা 'খবর'

হয়েছিল। শুনে কেউ খুশি হয়েছেন, কেউ বলেছেন ‘চমক’, কেউ কেউ এই ভেবে আপশোস করেছেন যে, এইভাবেই জলপাইগুড়িতে হিন্দুরা একদিন সংখ্যালঘু হয়ে যাবে। তবে এটা ঠিক যে, রাহুল-মেহনাজকে অতটা বিরোধিতা সহ্য করতে হবে না, যেটা দুলাল-রেজিনা করেছিলেন। তাঁদের ক্ষেত্রে ‘তৃণমূল-সিপিএম’ জোট হলেও সেটাকে অসম্ভব ভাবছেন না অনেকেই।

শিলিগুড়ি থেকে সাহিত্যিক বিপুল দাস ঘটনাটা শুনে বললেন, মানুষ হরেক বাধ্যবাধকতা থেকে রাজনীতি করতে পারে, কিন্তু প্রেম করে হৃদয় থেকে। এই কারণেই বাস্তবে এত গল্প থাকে। মহামানবরা প্রেমের কথা বলেছেন, মহাজনরা প্রেমের পদ রচনা করেছেন, পাগল প্রেমিকের খোঁজ পড়েছে যুগে যুগে। প্রেমের কাছে ধর্ম কী, আর রাজনীতিই বা কী।

এ কথা এক বাক্যে বাগডোগরা চিত্তরঞ্জন হাই স্কুলের সংস্কৃত শিক্ষক আবু ফিরোজ স্বীকার করলেন। তিনি বললেন, ‘ধর্ম আর রাজনীতির চাইতে প্রেমের জোর বেশি। এই জাতীয় সংবাদ মন ভাল করে।’

হলদিবাড়ি হাই স্কুলের ইংরেজি শিক্ষক সুদীপ্ত মোহন্তর স্ত্রী মুসলিম। সুদীপ্তবাবু ২০০৫ সালে বিয়ে করেছিলেন। তিনি অবশ্য তেমন কোনও সংকটের মুখে পড়েননি বলে জানালেন। দুর্গা পুজো আর ইদ— দুটোই উপভোগ করে তাঁর পরিবার।

এঁরা সকলেই রাহুল-মেহনাজকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক কলেজের অধ্যক্ষ দুলালবাবুকে বলেছেন, ‘রাজনীতিবিদরা মুখে যা বলেন, তার কিছু কিছু নিজের জীবনে পালন করলে গোটা সিস্টেমটার প্রতি লোকের আস্থাটা বাড়ে।’ অবশ্য দুলালবাবু নিজেকে এসবের জন্য মার্কস দিতে রাজি নন। তাঁর নীতি হল, কাজ করলে পদ এমনিই আসে। রাজনীতি নিয়ে অষ্ট প্রহর মেতে থেকে তিনি আনন্দ পান। একই জিনিস তিনি দেখেছেন সৌরভবাবুর মধ্যেও।

২০১৬-র বিধানসভার আগে আগে জলপাইগুড়ি জেলার নাগরাকাটাসহ অন্তত তিনটে আসনে দল হারছে বলে প্রশাসনও ভাবতে বসেছে, তখন দিদিকে দুলালবাবুই জোর দিয়ে বলেছিলেন, ‘সাতে সাত হবে।’ জলপাইগুড়ি সদর হবে না জানতেন, কিন্তু বাদবাকি মাপতে যে ভুল হয়নি, তা দল মনে রেখেছে।

পরবর্তী রণকৌশল ঠিক করতে গিয়ে বেয়াই সমিজুদ্দিন মহম্মদও মনে রাখছেন।

নিজস্ব প্রতিনিধি

ছবি: নিজস্ব চিত্র

হলদিবাড়ির পবিত্র হুজুর সাহেবের মেলা

ছোট্ট প্রান্তিক শহর হলদিবাড়ি। জেলা কোচবিহার হলেও মূল সদর থেকে এর দূরত্ব অনেক বেশি, প্রায় ১৪০ কিমি। জনসংখ্যা ২০১১-র আদমশুমারি অনুসারে প্রায় ১৫০০০-এর কাছাকাছি। তবে বর্তমানে ছিটমহলের জন্য জনসংখ্যা এক ধাক্কায় বেড়ে গিয়েছে অনেকটাই। হলদিবাড়িতে বেড়াতে এলে প্রথমেই বলতে হয় বর্ডারের কথা। চারদিক ঘিরে রয়েছে বাংলাদেশ বর্ডার। আছে কিছু সুসজ্জিত বিএসএফ ক্যাম্প। এটি মূলত পৌর এলাকা, কিন্তু চারপাশে ছড়িয়ে আছে সবুজ মাঠ ভরতি ফসলের গ্রাম এবং তিস্তা নদী। মূল শহরে রয়েছে দু’টি বড় উচ্চবিদ্যালয়, একটি পার্ক, একটি লাইব্রেরি, হাসপাতাল, পোস্ট অফিস, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ আর বিরাট অঞ্চল নিয়ে তৈরি হুজুর সাহেবের মাঠ। মাঠেই রয়েছে বিরাট মাজার শরিফ ‘দরবারে একরাম’। উলটো দিকে খোকা হুজুরের নবনির্মিত সমাধিস্থল। এ ছাড়াও আরও কিছু সমাধি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। এই মাজারের গায়ে লেপটে থাকা সুবিশাল মাঠেই বসে পবিত্র মেলা। সংলগ্ন পাড়াটিও মেলার মাঠ নামে পরিচিত (যদিও তা এই মেলার বহু আগে হওয়া আরেকটি মেলার নাম অনুসারে)।

আপাতদৃষ্টিতে শান্ত এই শহর এককালে সাংস্কৃতিক চর্চা, মূলত নাটকের জন্য বিখ্যাত ছিল। কিন্তু এখন বিশ্বায়নের দাপটে আর সব জায়গার মতো এখানেও এসব লুপ্তপ্রায়। তবু মাঝেমধ্যে প্রগতি নাট্য সংস্থা বা থিয়েটার সেন্টারের মতো কিছু দল নাটকের আয়োজন করে বা পৌর যুব উৎসব বা পাড়ার ক্লাবের প্রতিষ্ঠা দিবসের নানা ছোট ছোট অনুষ্ঠানে হলদিবাড়িবাসী মেতে ওঠে। তবে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে এই শহরের প্রতিটি মানুষ সারা বছর যার দিকে তাকিয়ে থাকে তা হল 'হুজুর সাহেবের মেলা'।

প্রতি বছর ৫ ফাল্গুন (১৮ ফেব্রুয়ারি) এই প্রান্তিক শহরের মাজার শরিফে সন্ত সুফি খান্দেকর মহঃ একরামুল হকের তিরোধান দিবসকে কেন্দ্র করে বসে হুজুর সাহেবের মেলা (ইসালে সওয়াব)। শোনা যায়, এই সন্ত সুফি সমাধিস্থ হন ১৯৪৩ সালে। তখন থেকেই এই দিনটিতে এখানকার হিন্দু ও মুসলিমরা ওঁর সমাধিতে আসেন প্রার্থনা করার জন্য। জ্বালিয়ে যান ইচ্ছের মোম। প্রথম দিকে এটি অনেকটা স্মরণসভা বা ধর্মসভা হিসেবেই প্রচলিত ছিল। নানা জায়গার মানুষরা এখানে আসতেন মূলত বক্তব্য শুনতে। সুফি একরামুল হকের জীবন কাহিনি শুনতে, যিনি পরবর্তীকালে পরিচিত হন হুজুর সাহেব নামে। জন্ম আনুমানিক ১৮৪৬ সালে, মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দিতে। পরে তিনি তাঁর ঠাকুরদা আজিজুর রহমানের কাছে আসেন কোচবিহারের ঝাঝলিতে এবং সেখানেই দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করেন। কথিত আছে, ছোটবেলা থেকেই তিনি অসীম ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। তাঁর ভিতর ছিল এমন কিছু শক্তি, যার ফলে অনেক অসম্ভবকে জয় করে ফেলতেন অনায়াসেই। তিনি আসাম ও উত্তরবাংলার কিছু অঞ্চলে ইসলামধর্মের প্রচার শুরু করলে অবিলম্বেই বিখ্যাত হয়ে যান, তৈরি হয় তাঁর কিছু অনুগামী। ধর্ম প্রচারের কাজে এর পর তিনি পা রাখেন হলদিবাড়িতে। কিন্তু ১৯৪৩ সালে তিনি সমাধি লাভ করেন পাশের জলপাইগুড়ি শহরের নবাববাড়ি মসজিদে। তাঁর অনুগামীরা এর পর তাঁরই ইচ্ছানুসারে সমাধিপ্রাপ্ত দেহ হলদিবাড়িতে নিয়ে আসেন, এবং এখন যেখানে বিরাট মাজার, সেখানেই তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। কথিত আছে, নিয়ে আসার সময় প্রবল বৃষ্টিতে চারদিক ডুবে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে যে অনুগামীরা তাঁকে নিয়ে আসছিলেন, তাঁদের গায়ে এক ফোঁটাও জল লাগেনি। তাঁরা নির্বিঘ্নে হুজুরের দেহ নিয়ে শোভাযাত্রা করে হলদিবাড়ি পৌঁছান। আজও হলদিবাড়ির আকাশে-বাতাসে কান পাতলে তাঁর এমন অনেক কাহিনি জানতে পারা যায়।

দরগার কাজ শুরু হয় ১৯৫৩ সালে। পাশের মসজিদটি তৈরি হয় ১৯৬২ সালে। দরগার কাছেই আছে হুজুরের কন্যা রাহেলা খাতুনের সমাধি। তিরোধান দিবসকে কেন্দ্র করে যে ধর্মসভা তা যে কখন এক বিরাট মেলায় পরিণত হল তা আজ আর হলদিবাড়িবাসীর মনেই পড়ে না। মাত্র একরাতের মেলায় ভিড় চোখে পড়বার মতোই। পরদিন দুপুর পর্যন্ত চলে ভাঙা মেলার রেশ। দূরদূরান্ত থেকে এত লোকসমাগম, পালটে যায় হলদিবাড়ির বরাবরের শান্ত চরিত্র। প্রায় সারা অঞ্চল জুড়ে বসে রকমারি জিনিসের সম্ভার। বিখ্যাত 'টমটম গাড়ি' আর নানা রঙের কাচের চুড়ি... এ ছাড়াও পাওয়া যায় ছোটবড় নানা ধরনের প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় জিনিস। পথের দু'ধার দিয়ে সারি সারি দোকান, কী নেই সেখানে! হরেক মাল পাঁচ টাকা এখন পঁচিশ টাকায় ঠেকেছে। বাসনপত্র, জামাকাপড়, ছোটদের নানা রকমের খেলনাপাতি, কাঠের তৈরি গাড়ি, ট্রাক, বইপত্র, আসবাব, বেতের সামগ্রী, ফলমূল, বিশেষত নারকেল কুল, মোড়া, পানের দোকান, লোহার তৈরি জিনিস আর অসংখ্য ভাতের হোটেল বা চাটঘর। যা চাইবে, সব হাতের মুঠোয়। বাঁশি বা ভেঁপুর আওয়াজ, দর হাঁকাহাঁকিতে মুখরিত চারদিক। বসে আনন্দমেলাও। নাগরদোলা, ড্রাগন ট্রেনে চেপে মজা করছে ছেলেমেয়েরা। মাটির জিনিসপত্রের দোকান আগে খুব চোখে পড়লেও ইদানীং আর বেশি আসে না। তবে নানা ফলের আকারে গড়া ঝাঁপির বেশ কদর আছে। রাস্তার দু'ধার দিয়ে গাড়িতে, ট্রাকে চড়ে দূর দূর থেকে নানা ধর্মের মানুষ আসে এই সমাধিতে... ভিড়, ধুলো সব কিছুকে উপেক্ষা করে স্থানীয় ও বহিরাগত লক্ষাধিক মানুষ মেতে ওঠে এই

মিলনমেলায়। ধূপকাঠি, মোমবাতি বা গোলাপ ফুল হাতে পৌঁছে যায় ঠিক যেখানে মহঃ একরামুল হককে সমাধিস্থ করা হয়েছে। উলটো দিকে আছে ওঁর নাতি খোকা হুজুরের সমাধি। সেখানেই মোম-ধূপকাঠি দেওয়ার জন্য বালির ঢিপি। চলে মনের বাসনা পূর্ণ করার প্রার্থনা। সারারাত ধরে চলে এই প্রার্থনা ও মিলনমেলা। রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়া সারি সারি উট দেখাও এক বিরাট অভিজ্ঞতা। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এখানে উট নিয়ে আসা হয় 'কুরবানি' দেওয়ার জন্য। রয়েছে বিশাল দানঘর। মনের বাসনা পূর্ণ হলেই ভক্তরা ওখানে পৌঁছে যায় চাল বা মুরগি উৎসর্গ করতে। প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই আত্মীয়-পরিজনের ভিড়। সব কিছুকে উপেক্ষা করে দলে দলে চলেছে মেলার উদ্দেশে। কী দারুণ দৃশ্য! সারারাত চলে মেলার বিকিকিনি। পরদিন সকালেও লোকের সমাগম দেখবার মতো। কেউ মেলা ফেরত, কেউ বা মেলায় প্রবেশ করছে, সব মিলিয়ে জমজমাট ব্যাপার। ভাঙা মেলায় জিনিসপত্র সস্তায় পাওয়ার লোভে ভিড়টা বেশি হয়। বিকেল থেকে শুরু হয় মেলা ভাঙার পালা। সন্ধের মধ্যে মেলার মাঠসহ হলদিবাড়ি শান্ত, নিশ্চুপ। কে বলবে, কিছু আগেই হইহট্টগোলে সরগরম ছিল চারদিক!

তবে বর্তমানে এই মেলার চরিত্র অনেকটাই বদলে গিয়েছে। দু'দিনের মেলা এখন তিন-চার দিনে ঠেকেছে। মেলার আগের এক সপ্তাহ জুড়ে চলে মেলা বসার মেলা। গাড়ি করে বাঁশ, দোকান দেওয়ার নানা সরঞ্জাম নিয়ে সকলে হাজির হয় এখানে। কেউ কেউ দোকান চালুও করে দেয় দু'দিন আগে থেকেই। আর মেলা ভাঙেও অনেক রাতে। সস্তায় জিনিস কেনার লোভে স্থানীয় লোকেরা কয়েকবার চক্কর কেটে আসে। মেলার মাঠ ছাড়াও, তালা কোম্পানি বা ক্ষুদিরাম পল্লিতেও এখন মেলার দৈর্ঘ্য বিস্তারলাভ করেছে। যেসব বাড়ির সামনে ফাঁকা মাঠ আছে, তারাও বসে থাকে না। কাগজের মধ্যে 'পার্কিং' লিখে সামনে ঝুলিয়ে রাখলেই হল, সারি সারি গাড়ি, বাইক দাঁড়িয়ে যাবে মুহূর্তে। সেই টাকাতেই হয়ত তাদের মেলা দেখার খরচ উঠে আসে। আজকাল কাছাকাছি বাড়িগুলোর সামনেও সবাই পান, বেলুন বা ওই জাতীয় নানা জিনিসের পসরা সাজিয়ে বসছে স্থানীয়রাও। সারা এলাকা জুড়ে ফকির-মৌলবিদের আনাগোনা। কেউ কেউ আবার হাতগণনাও করেন। তবে এই মেলায় প্রচুর ভিখিরি আসে ভিক্ষা করতে। মেলার আগে থেকেই হলদিবাড়িতে অচেনা মুখের সারি। কিন্তু তাদের মধ্যে অনেকেই ঠগ। কুষ্ঠ রোগী সেজে ভিক্ষা করছে বহু মানুষ— এটা অবশ্যই একটা খারাপ দিক। মানুষের ভিড়ে সারা শহর জুড়ে যানজট, ফলে স্থানীয়রা বিপদে পড়ে। বাস, ট্রাক, অটো, টেম্পো, ভ্যান রিকশা বা হালফিলের টোটো গাড়িতে শয়ে শয়ে মানুষ পুণ্যলাভের আশায় প্রতি বছর পাড়ি দিচ্ছে এই শহরে, কত লোকের পায়ের ধুলো পড়ছে হলদিবাড়ির মাটিতে— এ-ও কিন্তু কম ভাগ্যের ব্যাপার নয়! পুলিশে পুলিশে ছয়লাপ চারদিক। মালদা, মুর্শিদাবাদ, বহরমপুর, শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, ময়নাগুড়ি, ধুপগুড়ি, কোচবিহার, এমনকি সুদূর কলকাতা বা পাশের রাজ্য আসাম কিংবা বাংলাদেশ থেকেও লোক আসছে শুধুমাত্র ৫ ফাল্গুনের এই পবিত্র দিনটিতে মোম-ধূপকাঠি জ্বালিয়ে মনের আশা পূরণ করতে। করে যাচ্ছে পরের বছর ফিরে আসার অঙ্গীকার। হুজুর সাহেবের দরবারে এসে তাঁকে ভক্তিভরে ডাকলে খালি হাতে ফেরে না কেউ। বাবার অলৌকিক ক্ষমতার কাছে নতিস্বীকার করে সমস্ত অশুভ শক্তি। এই শক্তির জোরেই বোধহয় হলদিবাড়িতে কখনও কোনও প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটে না, আর ঘটবেও না বলেই হলদিবাড়িবাসীর বিশ্বাস। এই বিশ্বাসকে সঙ্গী করেই প্রতি বছর ওই দিন সবার তাকিয়ে থাকা। এই উন্মাদনা ভাষায় বর্ণনা করা অসম্ভব।

শাঁওলি দে

রাতের মাজারের ছবিটি তুলেছেন মনোজ রায় (পিন্টু) ও মেলার ছবিটি তুলেছেন সুব্রত বসু।

চ্যাংড়াবান্দার হক্ মনজিলের হুজুরের মেলা

কোচবিহার জেলার হলদিবাড়ির চিরপরিচিত হুজুর সাহেবের মেলার কথা সকলেরই জানা, কিন্তু এই কোচবিহারেরই চ্যাংড়াবান্দা ব্লকের হক্ মনজিলের হুজুরের মেলার কথা অনেকেরই জানা নেই। আয়তনে আর ব্যাপ্তিতে এ মেলা হলদিবাড়ির থেকে সামান্যই ছোট। ৩৪ বছরে পদার্পন করা এই মেলা জাতীয় সংহতির এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে দলে দলে যোগদান করেন এখানে। বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সর্ব ধর্ম সমন্বয়ের মানুষ আসেন মেলা প্রাঙ্গনে। এই হুজুর সাহেবের (মকসেদুল হক্) মাজারে মোমবাতি জ্বালিয়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন এবং মনষ্কামনা পূরণ করতে মেলায় উপস্থিত হয় আসাম, বাংলাদেশ এবং আশপাশের রাজ্য থেকে প্রচুর মানুষ।

বাংলা ক্যালেন্ডার মতে ৮ ও ৯ ফাল্গুন এই মেলা বসে। বাসনকোসন, গৃহসজ্জা থেকে শুরু করে সাজগোজের জিনিস, খেলনা, জামাকাপড় ইত্যাদি কী দোকান নেই এখানে! খাওয়ার স্টল রয়েছে প্রচুর, ঢাকাই পরোটা, মোগলাই পরোটা, জিলিপি, মোমো, চাউমিন ইত্যাদি সব ধরনের লোভনীয় খাওয়ার সামগ্রিই রয়েছে। আর রয়েছে বাচ্চাদেরর খুশি করার হাজার আইটেম। মেলা কমিটির উদ্যোক্তাদের মধ্যে জনৈক পারভেজ ইসলামের সঙ্গে কথা হচ্ছিল, উনি বললেন— মেলায় বিক্রিবাট্টা প্রচুর হয়, দু'দিন মাত্র মেলা চললেও কেনাকাটায় ভাটা পরে না। উল্টে ভিড় সামলাতে হিমশিম খেতে হয় ওনাদের। তবে এই দু'দিন যানজট এবং ধুলোর পরিমাণ বেড়ে যায় মারাত্মকভাবে।

এবার মেলা উদ্বোধন করেন সৈয়দ আফজালুল হক্। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক ডক্টর বিজয় চন্দ্র বর্মন, মেখলিগঞ্জের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক শ্রী বিরুপাক্ষ মিত্র। মেলার তরফ থেকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয় পদ্মশ্রী করিমুল হক্ মহাশয়কে। তাকে দেখতে এবং তার সঙ্গে ছবি তোলার উৎসাহ দেখা যায় চোখে পড়ার মতো।

হিমি মিত্র রায়

দৃষ্টিহীনদের প্রকৃতিপাঠ শিবির

উত্তরবঙ্গের মাঝে মূর্তি নদীর পাড় এক অসাধারণ জঙ্গল আর নদীর মিশেল, যা নিঃসন্দেহে একটি সৌন্দর্যের মাইলফলক। আর এই নদীর পাড়েই বন বিভাগের গোরুমারা টেন্টস। মূর্তিতে বসেছিল দৃষ্টিহীন ছেলেমেয়েদের নিয়ে ১৫তম বাৎসরিক প্রকৃতিপাঠ শিবির। যাদের নিয়ে এই আয়োজন, তাদের হয়ত চোখের দেখাটা হয় না, কিন্তু মন, অনুভব ও স্পর্শ দিয়ে তারা অনেক অনেক বেশি দেখতে পায়। ওদের সঙ্গে মিশতে থাকলে বোঝা যায় যে, ওদের প্রখর বুদ্ধি ও ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় কতটা বেশি প্রবল। আগামী চার দিন এটাই ওদের ঠিকানা। আর ওদের দেখভাল করার জন্য বিভিন্ন জায়গা থেকে ছুটে চলে এসেছেন অনেকেই। যেমন শিলিগুড়ি থেকে সস্ত্রীক শৈবাল মিত্র, দেবযানী মিত্র, ন্যাফ-এর অন্যতম কর্তা, যে কোনও ক্যাম্প নিবেদিত প্রাণ অনিমেষ বসু, সবার প্রিয়, প্রচুর অভিজ্ঞতার অধিকারী জীবনকৃষ্ণ রায়, পাটনি থেকে ছুটে এসেছেন মৌমিতা দাস, কলকাতা থেকে কৌশিক মুখোপাধ্যায়, এমন অনেকেই সব কাজ ছেড়ে শুধুমাত্র ভালবাসার তাগিদে চলে এসেছেন এদের পাশে থেকে ক'টা দিন কাটাবার জন্য। এমনই এক শীতের দুপুরে সব্বাই মিলে জড়ো হয়ে শুরু হল ক্যাম্প। দুপুরের খাওয়া সেরে সবাই মিলে লাইনে দাঁড়াল। প্রত্যেককে দেওয়া হল টুপি। জাতীয় পতাকা ও ন্যাফ-এর পতাকা উত্তোলন করলেন পি টি ভুটিয়া (Add. P.C.C.F., North Bengal)। উপস্থিত ছিলেন বিশেষ অতিথি সুমিতা ঘটক (C.F., Wildlife) ও নিশা গোস্বামী (D.F.O., Gorumara), ন্যাফ-এর কোঅর্ডিনেটর অনিমেষ বসু ও সচিব শঙ্কর মজুমদার। এঁরা প্রত্যেকেই তাঁদের নিজস্ব বক্তব্য রাখেন সমবেত শিশুদের উদ্‌বুদ্ধ করতে। এর পর প্রত্যেককে নির্দিষ্ট দলে এক তাঁবুতে ভাগ করে দেওয়া হয়। তাঁবুগুলির নাম যথাক্রমে মনিভেট, ময়না, বুলবুল, হর্নবিল ও পাঞ্জা। ছিল উত্তরবঙ্গের নানান জেলা থেকে আসা বিভিন্ন ভাষাভাষী কচিকাঁচা থেকে যুবক-যুবতীরাও। সবাইকে অবাক করে দিয়ে সাবিনা বলে উঠল, 'বাঃ! জায়গাটা কী সুন্দর দেখতে।' আর ছিলেন সবার কাছের মানুষ সুভাষ দে, একজন প্রতিষ্ঠিত অভিনেতা ও শিক্ষক। সব ক্যাম্পার দলে দলে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আশপাশটা বুঝে নিতেই ব্যস্ত হয়ে পড়ল। সন্ধে নামতেই জেকেদার পরিচালনায় মনোরম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শুরু হল ক্যাম্পারদের নিয়ে। রাত বাড়তেই রাতের খাবার খেয়ে ঘুম। পরদিন ভোর পাঁচটায় চা খেয়ে শারীরিক কসরত করে প্রাতরাশ সেরেই জেকেদার নেতৃত্বে মুক্তির জঙ্গলে প্রবেশ। প্রকৃতির ছোঁয়া নিতে নিতে পথ চলা, রাস্তায় চলতে চলতে পথের দু'ধারের নানান ফুল, পাতা, গাছ চিনে নেওয়া স্পর্শে-গন্ধে। চারদিকের নানান পাখির ডাক শুনে এটা কোন পাখি, ওটা কোন পাখি, কেমন তার চেহারা— এ সমস্তটাই খুঁটে খুঁটে জেনে নেওয়া। প্রসঙ্গত বলি, এইসব ছেলেময়ের সামনে হয়ত দশ রকমের গাছগাছালির পাতা দিয়ে বলা হল, কোনটা কোন গাছের পাতা। ওরা তখন সেটার উপর হাত বুলিয়ে, গন্ধ শুঁকে চিনে নিল। আর তার দু'দিন পর যদি তাদের জিজ্ঞেস করা হয়, কোনটা কোন গাছের পাতা? তাহলে দেখা যায়, বেশির ভাগ গাছের পাতাই তারা স্পর্শে-গন্ধে নির্ভুল বলতে পারছে। আর আমরা যারা দেখতে পাই, তাদের মধ্যে বেশির ভাগই ভুল বলছে। হাওয়া কোন দিকে বইছে, সেটাও নির্দ্বিধায় বলে দিতে পারছে তারা।

এমন একটি সুন্দর দিনে জঙ্গলের নানান অভিজ্ঞতা নিয়ে আবার ক্যাম্পে ফিরে আসা। সন্ধ্যায় সবার মতের আদান-প্রদান, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে হইচই করে কাটিয়ে, সারাদিনের পরিশ্রমে শ্রান্ত-ক্লান্ত ক্যাম্পাররা নৈশভোজ সেরে পরের দিনের জন্য তৈরি হতে যায়। সকালে উঠেই সবার কী আনন্দ। আজ সবাই মিলে দল বেঁধে হাতি দেখতে ও চিনতে যাওয়া হবে। ধুপঝোরার এলিফ্যান্ট ক্যাম্পে হাজির সবাই। কেউ হাতির কান ধরে বলছে, হ্যাঁ, এটা তো সেই কুলোর মতোই। কেউ পা ধরে বলছে, হ্যাঁ, এটা তো গাছের গুঁড়ির মতো। সবার আনন্দ একদম বাঁধনছাড়া। এর পর ওখান থেকে ফিরে সোজা মূর্তি নদীর স্বচ্ছ জলে গা ডুবিয়ে স্নান। জলকেলির পর আবার ক্যাম্পে ফেরা। আজ আবার শেষ রাত্রি। একটু মন খারাপের পাশাপাশি ক্যাম্প ফায়ারের আয়োজন। আজ প্রত্যেকেই তাঁদের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে ও গানবাজনা করে একটা সুন্দর সান্ধ্য জলসা পরিবেশন করলেন। তারপর রাত হতেই গ্র্যান্ড ফিস্ট। পরদিন ফেরার পালা। সবার মন খারাপ। অনেক রাত পর্যন্ত জেগে গল্পগুজব করতে করতে ঘুমের দেশে।

তিন দিন ধরে অনাবিল প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে কাটিয়ে সবার চোখেই জল, একে অপরকে জড়িয়ে ধরে কান্না। যতটা পারা যায় একে অপরের মোবাইল নম্বর জোগাড় করে নেওয়া। আবার এক বছরের প্রতীক্ষা। পরিশেষে একটা কথা না বললেই নয় যে, এই যে এত সুন্দর আয়োজন, তার সবটাই প্রয়াত তেনজিং নোরগে পরিবারের সহায়তায় ন্যাফ-এর আয়োজনে ও সংঘবদ্ধভাবে লাটাগুড়ি সোশাল ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন ও গোরুমারা ওয়াইল্ডলাইফ ডিভিশন-এর সহযোগিতায় সম্ভব হয়েছে। লাটাগুড়ি থেকে গাইড হিসেবে ছিলেন বিপ্লব সরকার, ঋত্বিক চক্রবর্তী, অনুপম দে। সবশেষে 'আসছে বছর আবার হবে' স্লোগান দিয়ে ক্যাম্প থেকে ফেরা।

দীপজ্যোতি চক্রবর্তী

ছবি: দেবযানী মিত্র

ডুয়ার্স ডেঞ্জারাস

চিত্রকথা 'ডুয়ার্স ডেঞ্জারাস'। পর্ব-৪। এই চিত্রকথা কোনওভাবেই ছোটদের জন্য নয়। আর কাহিনির সঙ্গে বাস্তবের মিল খুঁজতে যাওয়া অনভিপ্রেত।

ডুয়ার্স ডেঞ্জারাস

কাহিনি : বৈকুণ্ঠ মল্লিক, ছবি : দেবরাজ কর

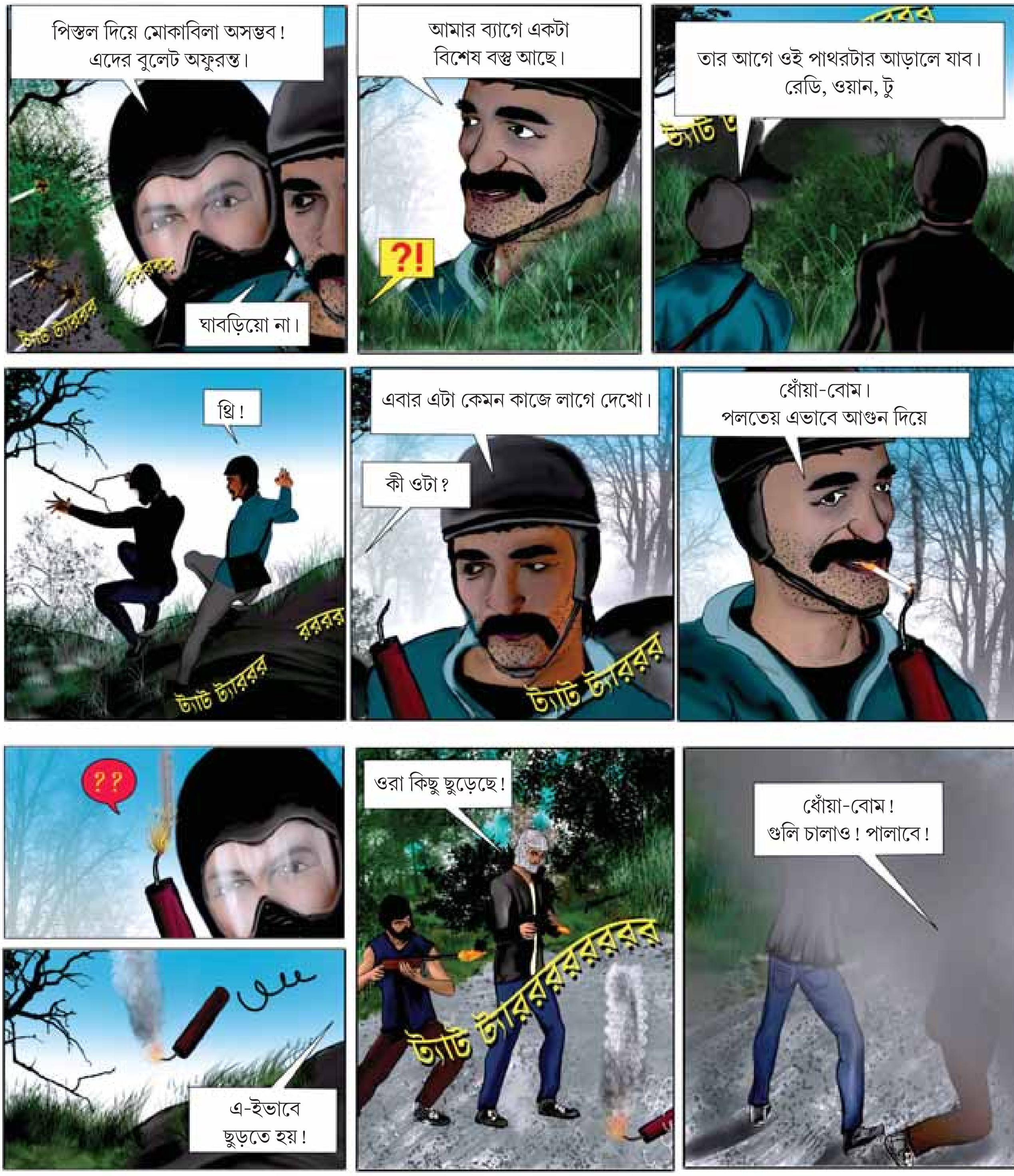

PRINTER & PUBLISHER : PRADOSH RANJAN SAHA. On behalf of owner Mr. Pradosh Ranjan Saha, printed at Albatross Graphic Solution Pvt. Ltd., published at 3 Rajdanga Gold Park, Kolkata 700107, Editor - Pradosh Ranjan Saha.